সবপেয়েছির আসর

284/Gift
NO- 91

সংগঠনী

হীরক জয়ন্তী বর্ষ

Library
Calcutta
35/1, B. C. Road

সংগঠনী

২০০৫ - ২০০৬

সবপেয়েছির আসর

উপদেষ্টা	➜	অজিত বসু
সভাপতি	➜	মৃণাল ব্যানার্জী
সম্পাদক	➜	বিশ্বজিৎ খাস্তগীর
সদস্য	➜	শ্যামল বসু, শ্রীদাম সাহা, ব্যোমকেশ ঘোষ, জয়দেব বারুই, সব্যসাচী চৌধুরী, সুব্রত কর্মকার
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও রূপায়ন	➜	সুজাতা সাহা
আলোকচিত্র	➜	সন্তু বসু
বর্ণসংস্থাপন ও মুদ্রণে	➜	'মুদ্রণ', ১/১বি, ডঃ অমল রায় চৌধুরী লেন, কলকাতা - ৯ দূরভাষ ঃ ৯৮৩০১-৭৪৮৯২

সবপেয়েছির আসর

—ঃ মূলকেন্দ্র ঃ—

কেন্দ্রীয় শিশুভবন, ৪, জেমস্ লঙ্ সরণী, বড়িযা, কলকাতা - ৭০০ ০০৮ (২৪৯৪-০২৫৯)

—ঃ শিক্ষণকেন্দ্র ঃ—

কক্ষ - ১২, ব্লক ৫-এ, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, কলকাতা - ৭০০ ০২৯ (২৪৬৫-০৫৬০)

সম্পাদকীয়

প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় 'স্বপনবুড়ো' প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী শিশু কিশোর উন্নয়ন সংগঠন 'সবপেয়েছির আসর'-এর দ্বি-বার্ষিক মুখপত্র 'সংগঠনী'।

সংগঠনের হীরক জয়ন্তী বর্ষে প্রকাশিত 'সংগঠনী'-কে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে শিক্ষা জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের কাছে বিশেষ বিষয় উল্লেখ করে লেখা পাঠাবার অনুরোধ করা হয়েছিল এবং তাঁদের মূল্যবান লেখনীতে সমৃদ্ধ হয়েছে এই সংখ্যাটি।

আবার এই বছরটি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষ এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের দেড়শ বছর হিসেবেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং সংগঠনীতে এই বিষয়গুলিও বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

আসরের মতাদর্শকে গুরুত্ব দেবার রীতি অনুযায়ী মৌলিক লেখার পাশাপাশি আসরের নিয়ম-শৃঙ্খলা, ব্যায়াম, বিগত বছরের অনুষ্ঠানের খবর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যও সংগঠনীতে স্থান পেয়েছে।

শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক গঠনের বিষয়, তথ্যমূলক মূল্যবান লেখনী, ছড়া আশাকরি সর্বশ্রেণীর পাঠকের ভাল লাগবে এবং সংগঠন সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনে আসবে।

শুভম্

স.পে.আ.

২৭ শে ডিসেম্বর,
২০০৫

বিশ্বজিৎ খাস্তগীর
সম্পাদক / প্রকাশনা বিভাগ

Acc No — 16179

সূচী

শ্রদ্ধাঞ্জলী	.....	.....	৪
মূল সত্যসেবীর কলমে	.....	.....	৫
স্মরণীয় যাঁরা বরণীয় তাঁরা	.....	.....	৬
সবপেয়েছির আসর (মূলকেন্দ্র)	.....	.....	৯
Sab Payechir Asar (Main Centre)	.....	.....	১১
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও কবিগুরুর একটি ভাষণ		.....	১৩
সবপেয়েছির আসরকে			
আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে	- ডঃ রমেশ চন্দ্র বসু	.....	১৫
যেন ভুলে না যাই	- অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়	.....	১৭
সাঁওতাল অভ্যুত্থানের দেড়'শ বছর	- শ্রী অরুণ চৌধুরী	.....	১৯
কিশোর মন একটু অন্য চোখে	- শ্রীমতী ঊর্মি চক্রবর্তী	.....	২৩
হীরক জয়ন্তী বর্ষে স.পে.আ.	- শ্রীদাম সাহা	.....	২৭
শব্দ দূষণ	- ডঃ জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ	.....	২৯
ছড়ার ডালি	- শ্রী ভবানীপ্রসাদ মজুমদার	.....	৩৩
সমবেত ব্যায়াম	.....	.....	৩৪
এক নজরে বাংলা শিশু চলচ্চিত্র	- অধ্যাপক পার্থ রাহা	.....	৩৫
হে মা ধরিত্রী, একটু ঠান্ডা হও	- শ্রীমতী মহুয়া চ্যাটার্জী	.....	৩৯
সবপেয়েছির আসর	.....	.....	৪১
একটি আসর গড়তে হলে	.....	.....	৪৫
Sab Payechir Asar	.....	.....	৪৬
জাতীয় পতাকা	.....	.....	৪৮
কেন্দ্রীয় সংগঠক ও শিক্ষক পর্ষদ	.....	.....	৫০
বার্ষিক শিক্ষা শিবির পঞ্জী	.....	.....	৫৩
শাখা আসর দেশ বিদেশে	.....	.....	৫৪
ধীর ব্যায়াম	.....	.....	৫৯
তালি ব্যায়াম	.....	.....	৬০
বারো মাসে তেরো পার্বণ	.....	.....	৬১

জয়ন্ত দেশমুখ্য (কবি দা) চলে গেলেন

সবপেয়েছির আসরের কর্মী পরিষদের অন্যতম স্তম্ভ, প্রাক্তন মূল সত্যসেবী জয়ন্ত দেশমুখ্য গত ৬ই অক্টোবর '০৪ মাত্র ৬২ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত অকাল বিয়োগে আমরা সবপেয়েছির আসরের সকল সোনারকাঠি, কর্মী ভাই-বোন গভীরভাবে শোকহত। জয়ন্ত দেশমুখ্য - 'কবি দা' নামে আমাদের সকলেরই অতিশয় প্রিয় ছিলেন।

১৯৪২ সালের ১২ই অক্টোবর পূর্ববঙ্গের (এখন বাংলাদেশ) ফরিদপুর জেলার খোলাবাড়িয়া গ্রামে কবিদার জন্ম হলেও প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন কলকাতার শ্যামবাজার হাইস্কুলে। তাঁর বিদ্যালয়স্তরের শিক্ষা শেষ হয় উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগর বয়েজ সেকেন্ডারী স্কুলে। হাবড়া চৈতন্য কলেজ থেকে অর্থশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রী এবং শারীর শিক্ষণে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন রাজস্থানের শারীর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে। শিক্ষা সম্পন্ন করে কবিদা কল্যানগর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে শারীর শিক্ষণ বিভাগে যোগদান করেন। স্বপনবুড়োর আদর্শে শিশু কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক দিকগুলি গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে ১৯৬৭ সালে রক্তরবি সবপেয়েছির আসরে কর্মী এবং ১৯৭৩ সালে সবপেয়েছির আসর মূলকেন্দ্রের কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন।

তিন দশকেরও বেশী সময় বিভিন্ন পদে মূলকেন্দ্রের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে একাধিকবার তিনি সফলভাবে মূল সত্যসেবীর (সাধারণ সম্পাদক) দায়িত্ব পালন করেছেন। বার্ষিক শিক্ষাশিবিরগুলির সুষ্ঠ পরিচালনায় বরাবরই তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। সবপেয়েছির আসরের সর্বাধিক কাজে নিয়ত উপস্থিত থাকলেও শারীরশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি অনুকরণীয় অবদান রেখেছেন। সদালাপী, শিশু ও বন্ধুবৎসল কবি দা কাজের ক্ষেত্রে কঠোর শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে সবপেয়েছির আসরের কার্যধারার অপূরনীয় ক্ষতি হল।

সবপেয়েছির আসর মূলকেন্দ্রের কার্যনির্বাহী সমিতি ১৫ই অক্টোবর '০৪ একটি বিশেষ সভায় তাদের প্রাণপ্রিয় সহকর্মী জয়ন্ত দেশমুখ্যের আকস্মিক প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করে একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের (জয়ন্ত দেশমুখ্যের স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ) প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে শোক প্রস্তাবের অনুলিপি কবিদার পরিবারের সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

২১শে নভেম্বর '০৪ কলকাতার ভিক্টোরিয়া মহাবিদ্যালয়ে সবপেয়েছির আসর মূলকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় সকল কেন্দ্রীয় কর্মী, অঞ্চল ও শাখা আসর এবং বেঙ্গল ওলিম্পিক এসোসিয়েশন, বাংলার ব্রতচারী সমিতি, রাজ্য খো খো সংস্থা, কিশোর বাহিনী সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ্য থেকে কবি'দার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। মূলকেন্দ্রের সভাপতিমণ্ডলী, প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মীবৃন্দ চোখের জলে প্রিয় কবি দা'র স্মৃতিচারণ করে শ্রদ্ধা জানান।

সুনীল দা চলে গেলেন

সবপেয়েছির আসরের প্রথম যুগে স্বপনবুড়োর আহ্বানে যে সকল তরুণ কর্মী সংগঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করে, সুনীল চক্রবর্তী তাদের অন্যতম। তিনি হাওড়ার শুভা সবপেয়েছির আসরের কর্মী ছিলেন। খেলাধূলায় এবং সংগঠনের অন্যান্য বিভাগীয় কাজগুলিতে তিনি ছিলেন সমান উৎসাহী। সবপেয়েছির আসর মূলকেন্দ্রের কাজে যোগ দিয়ে বিভিন্ন আসরে ও শিক্ষণ শিবিরে যে সকল বিষয়ে তিনি শিক্ষণ দিতেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ডাম্বল ড্রিল, লোটাস ড্রিল ইত্যাদি। কুচকাওয়াজ শিক্ষণেও তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। পশ্চিমবাংলায় খো খো খেলার প্রসারে তাঁর অপরিসীম ভূমিকা ছিল। রাজ্য ও জাতীয় খো খো অফিসিয়াল পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গত শতাব্দীর ছয়ের দশক থেকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে খো খো - রেফারিং করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি রাজ্য ভলিবল এসোসিয়েশনের সাথে জড়িত হয়েছিলেন এবং ভলিবল জগতে তিনি মামা নামে খ্যাত ছিলেন। শিক্ষণ ছাড়া আসরের দপ্তরের কাজকর্মে তিনি সুনিপুন ভাবে কাজ করে দীর্ঘদিন মূলকেন্দ্রের দপ্তর সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। সদা হাস্যময় এই মানুষটি পেশায় ছিলেন একজন শিক্ষক। সাম্প্রতিক মূলকেন্দ্রের কোন পদে না থাকলেও সংগঠনের আহ্বানে বার্ষিক শিবির ও নববর্ষ উৎসবে হাজির হয়ে দপ্তরের কাজে নিমগ্ন হতেন। তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সকলের প্রশংসালাভ করে।

এমন একটি সরল হাস্যময়, অকৃতদার মানুষটি কিছু দিন ধরে নানারোগে জর্জরিত হয়ে চিরবিদায় নিলেন। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

মূল সত্যসেবীর কলমে

হীরক জয়ন্তী পূর্তি উৎসব-এ প্রকাশিত সংগঠনীর জন্য লিখতে বসে শুধু একটা কথাই বারবার মনে পড়ছে যে, আজ থেকে প্রায় ৬১ বছর আগে আমাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক প্রয়াত 'স্বপনবুড়ো' শোভাবাজার রাজবাড়িতে কিছু শিশুমনস্ক ব্যক্তিদের নিয়ে যে মানুষগড়ার কারখানার পত্তন করেছিলেন সেটিই হোল আমাদের সকলের প্রাণের সংগঠন - "সবপেয়েছির আসর"। দীর্ঘ ৬১ বছর ধরে আমরা সমস্তরকম আর্থ-সামাজিক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে সকলের কাছে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছি। সাথে সাথে আমরা সমাজকে উপহার দিতে পেরেছি বহু সংখ্যক রুচিশীল সুস্থ সবল নাগরিককে।

মনেরাখতে হবে আমারে সংগঠন শুধুমাত্র দৈনন্দিন বৈকালিক অবসর সময় কাটানোর জন্য নয়। বর্তমানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর প্রেক্ষিতে শিশুদের সুস্থ চিন্তা-ভাবনাগুলির প্রকাশের পথটা থমকে যাচ্ছে বিনোদনের নামে সকলের মাঝে উপস্থাপিত বিষয় বস্তুগুলির জন্য। তাই আমরা প্রতিনিয়তই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এই সমস্ত শিশুদের শারীর শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে। যার সাহায্যে তারা আগামীদিনে নিজেদের মানুষ হিসাবে বিকশিত করার রসদ পায়। কারণ প্রাজ্ঞ শিশুবিদ্‌রা বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই শঙ্কা প্রকাশ করছেন। তাই শিশুর স্বাভাবিক বৌদ্ধিক বিকাশের সুন্দর পরিবেশ আমাদের মতন সংগঠনের মাধ্যমে করতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের মত দায়বদ্ধ স্বেচ্ছাসেবীদেরতো হতাশ হলে চলবে না। আমাদের আরদ্ধ কাজ করে যাই। কোন প্রলোভন, প্রতিবন্ধকতাই আমাদের এই মানুষ গড়ার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে পারবে না।

আমরা শিশুদের ভালবাসি। ওদের বড় হবার, ভাল হবার পথকে সুগম করতে চাই। ওদের শৈশবকে স্মৃতিতে, প্রাপ্তিতে হীরক আলোয় ভরিয়ে দিতে চাই। সময় ও সমাজের টানাপোড়েনে শৈশব হারাচ্ছে যে - শিশু, তাদের উদ্দেশ্যে এবারের সংগঠনী উৎসর্গিত হোক।

পরিশেষে প্রত্যেক সোনারকাঠি ভাই-বোন, কর্মী, অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের 'হীরক জয়ন্তী বর্ষে'র আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শুভম্ সবপেয়েছির আসর

মৃণাল ব্যানার্জী
মূল সত্যসেবী

মূলকেন্দ্র
১০ই ডিসেম্বর, ২০০৫

স্মরণীয় যাঁরা বরণীয় তাঁরা

সাধারণভাবে যে সকল মহাপুরুষ ও মনীষীদের জন্মদিন আমরা সারা বছর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, সেই স্মরণীয় দিনগুলো —

বৈশাখ	পূর্ণিমা	বুদ্ধদেব
,,	২৫	রবীন্দ্রনাথ
জ্যৈষ্ঠ	১১	কাজী নজরুল ইসলাম
আষাঢ়	১৩	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
,,	১৪	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
শ্রাবণ	১৬	প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
,,	২২	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধানদিবস
,,	৩০	সুকান্ত ভট্টাচার্য
ভাদ্র	জন্মাষ্টমী	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
,,	৩১	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আশ্বিন	১২	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
অগ্রহায়ণ	১৩	গুরুনানক
মাঘ	১১	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ফাল্গুন	দোলপূর্ণিমা	শ্রী গৌরাঙ্গ
,,	১৪	শ্রীরামকৃষ্ণ
জানুয়ারি	১২	স্বামী বিবেকানন্দ
,,	২৩	নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু
মে	১০	গুরুসদয় দত্ত
জুলাই	১	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
আগষ্ট	১৫ স্বাধীনতা দিবস	শ্রী অরবিন্দ
,,	২৯	নজরুল ইসলামের তিরোধান দিবস
অক্টোবর	২	মহাত্মা গান্ধী
,,	২৭	স্বপনবুড়ো
,,	২৮	ভগিনী নিবেদিতা
নভেম্বর	৫	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন
,,	১৪	জওহরলাল নেহরু
,,	৩০	জগদীশচন্দ্র বসু
ডিসেম্বর	৩	শহীদ ক্ষুদিরাম

সমস্ত শাখা আসর এই সকল নির্দিষ্ট দিনে তাদের নিজ নিজ আসরে ঘরোয়াভাবে এবং সম্ভব হলে অনুষ্ঠান করে মহাপুরুষদের জন্মদিবস ও প্রয়াণ দিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করলে আমরা আনন্দিত হব। এছাড়াও অন্যান্য জন্মদিন শাখা আসর ইচ্ছে করলে পালন করতে পারে।

বার্ষিক শিবিরে (২০০৩) মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শৈলেন সরকার, সাংসদ মহঃ সেলিম ও সংগঠন সভাপতি অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বার্ষিক শিবিরের (২০০৩) সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শিবির সচিব জয়ন্ত দেশমুখ্য সহ সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ।

বার্ষিক শিবিরের (২০০৪) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত, উপেন কিস্কু সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পতাকা দিবস ২০০৫। প্রথম পতাকা গ্রহণ করছেন মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী গোপালকৃষ্ণ গান্ধী।

সবপেয়েছির আসর - মূলকেন্দ্র

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মাননীয় শ্রী গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী (রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ)

পৃষ্ঠপোষকমণ্ডলী

ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র - (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)
শ্রী সুভাষ চক্রবর্ত্তী - (মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ)
শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য - (মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ)
শ্রী শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায় - (মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ)
শ্রী নিমাই মাল - (মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ)
শ্রী শৈলেন সরকার - (মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ)
শ্রী কান্তি গাঙ্গুলী - (মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ)
শ্রী সুজন চক্রবর্ত্তী - (সাংসদ)
জনাব মহম্মদ সেলিম - (সাংসদ)
শ্রীমতী অপর্ণা গুপ্ত - (সভাধিপতি, উত্তর ২৪ পরগণা)
শ্রী বিকাশ ভট্টাচার্য - (মেয়র, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন)
ডঃ ভারতী মুখার্জী - (উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ডঃ রথীন্দ্রনাথ দে - (নির্দেশক, এস. সি. ই. আর. টি.)
অধ্যাপক জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায় - (প্রাক্তন সভাপতি, প. ব. উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ)
ডঃ দিব্যেন্দু হোতা - (প্রাক্তন সভাপতি, প. ব. মধ্য শিক্ষা পর্ষদ)
শ্রী নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ - (প্রাক্তন আই. জি. পশ্চিমবঙ্গ)
শ্রী দেবাদিত্য চক্রবর্ত্তী - (আই. এ. এস.)
জুনিয়র পি. সি. সরকার - (যাদুকর)

প্রধান উপদেষ্টা

অধ্যাপক বুদ্ধদেব চক্রবর্তী

উপদেষ্টামণ্ডলী

শ্রী পরশ দত্ত - (বিধায়ক)
শ্রী পার্থ চ্যাটার্জী - (বিধায়ক)
শ্রী এস. বি. মণ্ডল - (প্রধান সচিব, ক্রীড়া দপ্তর)
শ্রী স্বপন চক্রবর্ত্তী - (মুখ্য-সচিব, ক্রীড়া দপ্তর)
শ্রী অজয় কুমার ঘোষ - (যুগ্ম-সচিব পশ্চিমবঙ্গ, ক্রীড়া দপ্তর)
ডঃ অতীন্দ্রনাথ দে - (অধ্যক্ষ, শরীর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হোস্টিংস্)
ডঃ জ্যোতি প্রকাশ ঘোষ - (প্রাক্তন সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)
ডঃ আবদুস সাত্তার - (সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ)
শ্রী স্বপন সাধন বসু (টুটু বসু) - (মুখ্য সম্পাদক, সংবাদ প্রতিদিন)
শ্রীমতী রমলা চক্রবর্ত্তী - (সভানেত্রী, পথের পাঁচালী)
শ্রীমতী কবিতা রায় চৌধুরী - (সম্পাদিকা, প. ব. রাজ্যবিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থা)
শ্রী প্রদীপ রায় - (প্রাক্তন মূল সত্যসেবী, স. পে. আ.)
শ্রী পূর্ণেন্দু বসু - (নবাকাঙ্খী স. পে. আ.)
শ্রী কমলেশ চ্যাটার্জী - (সম্পাদক, বেঙ্গল ওলিম্পিক এসোসিয়েশন)
শ্রী দিলীপ রায় - (সম্পাদক, রাজ্য খো খো সংস্থা)
শ্রী অসিত দাস - (সম্পাদক, উত্তর কলকাতা জেলা ক্রীড়া সংস্থা)
শ্রী প্রদীপ রায় (গোরা রায়) -
শ্রী সমীর মিত্র - (সম্পাদক, রাজ্য ইয়ুথ হোস্টেল এসোসিয়েশন)
শ্রীমতী বাণী সরস্বতী - (প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীমা মহিলা সমিতি, দত্তপুলিয়া)
শ্রী প্রনয় সাহা - (সম্পাদক, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, বাংলাদেশ)
শ্রী নিরঞ্জন অধিকারী - (সভাপতি, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, বাংলাদেশ)
শ্রী লুনদুব দর্জি লামা - (নেপাল)
শ্রী ভরত ভূষন রাইনা - (জম্মু-কাশ্মীর)
শ্রীমতী আরতি শ্রীমল -
শ্রী আশিস নিয়োগী -
শ্রী স্বপন মুখার্জী - (রোটারী ক্লাব)
শ্রী বিষ্ণু জীবন চক্রবর্ত্তী - (সম্পাদক, ইয়ংস এসোসিয়েশন)

কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি ২০০৪ - ০৬

প্রধান উপদেষ্টা	-	অধ্যাপক বুদ্ধদেব চক্রবর্ত্তী
সভাপতি	-	অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়
কার্যকরী সভাপতি	-	ডঃ রমেশ চন্দ্র বসু
সহঃ সভাপতি	-	শ্রী অজিত বসু শ্রী অপূর্ব গাঙ্গুলী শ্রী গণেশ ঘোষ
মূল সত্যসেবী	-	শ্রী মৃণাল ব্যানার্জী
সহঃ মূল সত্যসেবী	-	শ্রী তরুণ চক্রবর্ত্তী
সংগঠন সচিব	-	শ্রী শ্রীদাম সাহা
অর্থ সচিব	-	শ্রী শ্যামল বসু
শিক্ষণ সচিব	-	শ্রী অপরেশ মজুমদার
শিবির সচিব ও হিসাব রক্ষক	-	শ্রী দিলীপ চক্রবর্ত্তী
দপ্তর সচিব	-	শ্রী রাধাগোবিন্দ পোদ্দার
পরীক্ষা সচিব	-	শ্রী ব্যোমকেশ ঘোষ
সাংস্কৃতিক সচিব	-	শ্রী প্রদীপ দাস
সেবা সচিব	-	শ্রী পতিত পাবন দাস
ক্রীড়া সচিব	-	শ্রী বলরাম হালদার
প্রচার সচিব	-	শ্রী অপরেশ সরকার
শিশু ভবন ভারপ্রাপ্ত	-	শ্রী নিখিল রায়
মূখ্য প্রশিক্ষক	-	শ্রী সনৎ ভট্টাচার্য
সদস্য	-	শ্রী সজল চন্দ শ্রী নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য শ্রীমতী মহামায়া ঘোষ শ্রী বিশ্বজিৎ খাস্তগীর শ্রী শুভেন্ মুখার্জী শ্রী পঙ্কজ সরকার
হিসাব পরীক্ষক	-	মেসার্স পি. মজুমদার এন্ড কোং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেট

সবপেয়েছির আসর (মূলকেন্দ্র)

হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপন সমিতি

২০০৪-২০০৫

প্রধান পৃষ্ঠপোষক	-	শ্রী গোপল কৃষ্ণ গান্ধী *মাননীয় রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ*
প্রধান উপদেষ্টা	-	শ্রী সুভাষ চক্রবর্ত্তী *মাননীয় মন্ত্রী, পঃ বঃ সরকার*
সভাপতি	-	অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়
কার্যকরী সভাপতি	-	ডঃ রমেশ চন্দ্র বসু
চেয়ারম্যান	-	শ্রী কমলেশ চ্যাটার্জী
সহঃ সভাপতি	-	শ্রী অজিত বসু ও শ্রী গণেশ ঘোষ
সম্পাদক মন্ডলী	-	শ্রী দিলীপ চক্রবর্ত্তী শ্রী বিশ্বজিৎ খাস্তগীর শ্রী তরুণ চক্রবর্তী
সহঃ সম্পাদক	-	শ্রী চন্দন শূর রায় ও শ্রী সব্যসাচী চৌধুরী
সংগঠন সম্পাদক	-	শ্রী অপূর্ব গাঙ্গুলী
মুখ্য সংযোজক	-	শ্রী মৃণাল ব্যানার্জী (মূল সত্যসেবী)
কোষাধ্যক্ষ	-	শ্রী শ্যামল বসু
দপ্তর (ভারপ্রাপ্ত)	-	শ্রী রাধাগোবিন্দ পোদ্দার ও শ্রী জয়দেব বারুই
সদস্য	-	শ্রী নিখিল রায়, শ্রী সজল চন্দ, শ্রী প্রদীপ দাস, শ্রী অপরেশ মজুমদার, শ্রী নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য, শ্রী পতিত পাবন দাস, শ্রী অপরেশ সরকার, শ্রী ব্যোমকেশ ঘোষ, শ্রী প্রণব রায়, শ্রী তপন গুপ্ত, শ্রী তিমির বরণ সরস্বতী, শ্রী প্রণব বসু, শ্রী প্রশান্ত চ্যাটার্জী, শ্রী শুভেন্দু মুখার্জী ও শ্রী অনুপ উকিল।

SAB PAYECHIR ASAR
(Main Centre)

Patron in Chief :

HON'BLE SRI GOPAL KRISHNA GANDHI

(His excellency Governor of West Bengal)

PATRONS :

Dr. Pratap Chandra Chandra	:	*(Ex. Minister, Govt. of India)*
Sri Subhash Chakraborty	:	*(Minister, Govt. of West Bengal)*
Sri Nanda Gopal Bhattacharya	:	"
Sri Srikumar Mukhopadhaya	:	"
Sri Nimai Mal	:	"
Sri Sailen Sarkar	:	"
Sri Kanti Ganguli	:	"
Sri Sujan Chakraborty	:	*(M. P.)*
Janab Md. Selim	:	*(M. P.)*
Smt. Aparna Gupta	:	*(Sabhadhipati, North 24 Pgs.)*
Sri Bikash Bhattacharya	:	*(Mayor, Kolkata Municipal Corporation)*
Dr. Bharati Mukherjee	:	*(Vice Chancellor, Rabindrabharati University)*
Dr. Rathindranath Dey	:	*(Director, S. C. E. R. T.)*
Prof. Jyotirmoy Mukhopadhaya	:	*(Ex. President, W. B. H. S. Council)*
Dr. Dibendu Hota	:	*(Ex. President, W. B. B. S. E.)*
Sri Narayan Chandra Ghosh	:	*(Ex. I. G., W. B.)*
Sri Debaditya Chakraborty	:	*(I. A. S.)*
Junior P. C. Sarkar	:	*(Magician)*

CHIEF ADVISOR :

Prof. Buddhadeb Chakraborty

ADVISORS :

Sri Parash Dutta	:	*(MLA)*
Sri Partha Chatterjee	:	*(MLA)*
Sri S. B. Mondal	:	*(Principal Secretary, Sports, W. B.)*
Sri Swapan Chakraborty	:	*(I.A.S.)*
Sri Ajoy Kumar Ghosh	:	*(Jt. Secretary, Sports, W. B.)*
Dr. Atindranath Dey	:	*(Principal, P. G. P. T. College, Hestings)*
Dr. Jyoti Prakash Ghosh	:	*(Ex. President, W. B. Primary Education)*
Dr. Abdul Sattar	:	*(Chairman, Madrasa Education, W. B.)*
Sri Swapan Sadhan Basu	:	*(Chief Editor, Sanbad Pratidin)*
Smt. Ramala Chakraborty	:	*(President, Pather Panchali)*
Smt. Kabita Roy Chowdhury	:	*(Secretary, W. B. School Sports)*
Sri Pradip Roy	:	*(Ex. Chief Secretary, S.P.A.)*
Sri Purnendu Basu	:	*(Nabakankhi, S.P.A.)*

Sri Kamalesh Chatterjee	:	*(Secretary, B. O. A.)*
Sri Dilip Roy	:	*(Secretary, W. B. Kho-Kho Assn.)*
Sri Asit Das	:	*(Secretary, North Kol. Sports Orgn.)*
Sri Prodip Roy (Gora Roy)	:	
Sri Samir Mitra	:	*(Secretary, Youth Hostel Assn., W. B.)*
Smt. Bani Saraswati	:	*(Founder, Sreema Mahila Samiti)*
Sri Pronoy Saha	:	*(Secretary, Kendriya Khelaghar Asar, Bangladesh)*
Sri Nironjan Adhikari	:	*(President, Kendriya Khelaghar Asar, Bangladesh)*
Sri Lundub Darji Lama	:	*(Nepal)*
Sri Bharat Bhusan Raina	:	*(Jammu & Kashmir)*
Smt. Arati Sreemal	:	
Sri Ashish Neogi		
Sri Swapan Mukherjee	:	*(Rotary Club)*
Sri Bishnu Jiban Chakraborty	:	*(Secretary, Youngs Assn.)*

—: CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE :—

President	:	Prof. Ranju Gopal Mukhopadhaya
Working President	:	Dr. Ramesh Chandra Basu
Vice-President	:	Sri Ajit Basu
	:	Sri Apurba Ganguli
	:	Sri Ganesh Ghosh
Chief Secretary	:	Sri Mrinal Banerjee
Dy. Chief Secretary	:	Sri Tarun Chakraborty
Organising Secretary	:	Sri Sreedam Saha
Treasurer	:	Sri Shyamal Basu
Training Secretary	:	Sri Aparesh Majumder
Camp Secretary & Accountant	:	Sri Dilip Chakraborty
Office Secretary	:	Sri Radha Gobinda Podder
Examination Secretary	:	Sri Boymkesh Ghosh
Cultural Secretary	:	Sri Pradip Das
Welfare Secretary	:	Sri Patit Paban Das
Sports Secretary	:	Sri Balaram Halder
Publicity Secretary	:	Sri Aparesh Sarkar
Sishubhaban In-Charge	:	Sri Nikhil Roy
Chief Trainer	:	Sri Sanat Bhattacharya
Members	:	Sri Sajal Chanda
	:	Sri Nityananda Bhattacharya
	:	Smt. Mahamaya Ghosh
	:	Sri Biswajit Khastagir
	:	Sri Subhendu Mukherjee
	:	Sri Pankaj Sarkar
Auditors	:	M/s. P. Majumder & Co. *Chartered Accountant*

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও কবিগুরুর একটি ভাষণ

"উনিশ শ' পাঁচ দেখায় আলো,
শিখব দেশকে বাসতে ভালো।"

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শতবর্ষকে স্মরণ করে এ বছর নববর্ষ উৎসব প্রাঙ্গণে আমরা এই শপথবাক্য উচ্চারণ করেছিলাম। তারপর বিগত মাসগুলিতে আমাদের রাজ্যে এই প্রসঙ্গে অনেক সভা-সমাবেশ হয়েছে, আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে, সারগর্ভ-পুস্তক প্রণীত হয়েছে, পত্রপত্রিকায় তথ্য ও ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও সংগঠিত হয়েছে। এই সারস্বত কার্যধারা অনুধাবন করে আমরা একশ বছর আগের ঐ জনজাগরণ সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি, বুঝেছি। সংক্ষেপে তার প্রধান বিষয়গুলি ছিল এইরকম ঃ

১। বঙ্গদেশকে বিভক্ত করার যুক্তি হিসেবে ইংরেজ শাসকরা প্রশাসনিক জটিলতা কমাবার কথা বলেছিল। কিন্তু আসলে এর পেছনে ছিল বাঙালী জাতিকে দুর্বল করে দেবার চক্রান্ত। কারণ, শাসকদল টের পেয়েছিল যে বাঙালীরাই সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের বিতাড়িত করে দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখছিল, উদ্যোগ নিচ্ছিল। তারা বুঝেছিল যে বাঙালীর এই স্বাধীনতা স্পৃহাকে ঠেকাতে না পারলে এ দেশে তাদের শাসন বেশীদিন টিকবে না।

২। বাঙালীর শক্তিকে খর্ব করার লক্ষ্যে তারা নিয়েছিল বিভাজনের নীতি। তারা জানত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শত্রুতা ও ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়াই বাঙালীর স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে দমন করার শ্রেষ্ঠ উপায়।

৩। বাংলার চিন্তাবিদ্‌মহল এবং রাষ্ট্রনেতারা ইংরেজের এই দুরভিসন্ধি বুঝতে বিলম্ব করেননি। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন দেশের আপামর মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে দেশবাসীর দাসত্ব ঘোচানো যাবে না।

৪। দেশের মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে তাঁদের অভিযান আশাতীত সাফল্য লাভ করল। বাংলাকে বিভক্ত করার পদক্ষেপ ইংরেজের কাছে নিয়ে এলো সম্পূর্ণ বিপরীত ফল। দেশপ্রেম ও সম্প্রীতির মন্ত্রে সমগ্র বাঙালী সমাজ ঐক্যবদ্ধ ও উজ্জীবিত হয়ে উঠল।

৫। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তটি প্রত্যক্ষভাবে ছিল রাজনৈতিক। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার গভীরতা ও ব্যাপকতায় জন্ম নিল এক প্রবল সামাজিক জাগরণ। সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রকেই তা প্লাবিত করল।

৬। বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত ঘোষণা হয় ১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। কিন্তু প্রতিবাদের সূচনা হয়েছিল ১৯০৩ সালের শেষদিক থেকেই। সমাজের সকল অংশের সব বয়সের মানুষ এই ধারাবাহিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। অজস্র সভা, সম্মেলন, গণস্বাক্ষর, ধর্মঘট, বিলাতীপণ্য বয়কট প্রভৃতির মাধ্যমে সারা বাংলার গ্রাম-শহর উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

৭। বাঙালীর জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রের মত সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতেও এই প্রতিরোধের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। এই উপলক্ষে রচিত হয়েছিল অনেক নতুন গান, কবিতা, গল্প, নাটক।

৮। ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ ছিল বঙ্গভঙ্গের দিবস। সেদিন বাংলার ঘরে ঘরে পালিত হয়েছিল অরন্ধন। ঐক্যের চিহ্ন হিসেবে হয়েছিল রাখী বিনিময়। মন্ত্র ছিল — 'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই'।

৯। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ দিন সকালে পদযাত্রার সামনের সারিতে হেঁটেছিলেন গান গাইতে গাইতে। নিজে মুসলমান ভাইদের হাতে পরিয়েছিলেন প্রীতির রাখী।

১০। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ছিল বিজয়ার দিন। সেই উপলক্ষে কবিগুরু একটি মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন।

আমরা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষকে স্মরণ করে সেই অবিস্মরণীয় অভিভাষণের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

সম্পাদক

"... এতদিন বিজয়া-মিলনের সীমাকে আমরা সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যে মিলন আমাদের সমস্ত দেশের অখণ্ড ধন তাহাকে আমরা ঘরে ঘরে খণ্ডিত করিয়া বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম বিজয়া-মিলনকে কেবল আমাদের আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলাম;এ কথা ভুলিয়াছিলাম যে, যে-উৎসব আমাদের সমগ্র দেশের উৎসব সেই উৎসবে দেশের লোককে ঘরের লোক করিয়া লইতে হয়; সেই উৎসবের দিনে শরতের অম্লান আলোকে সুবর্ণমণ্ডিত এই যে নীলাকাশ ইহাই আমাদের গৃহের ছাদ, সেই উৎসবের দিনে শিশিরধৌত নবধান্যশ্যামলা এই নদীমালিনী ভূমি

ইহাই আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ, বাঙালি জননীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে-কেহ একটি একটি করিয়া বাংলা কথা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছ সেদিন সেই আমাদের বন্ধু, সেই আমাদের আপন— এতকাল ইহাই আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই বলিয়া আমাদের মিলনের মহাদিন বৎসরে বৎসরে আসিয়া বৎসরে বৎসরে ফিরিয়া গেছে। সে তাহার সম্পূর্ণ সফলতা রাখিয়া যায় নাই।

একাকিনী যমুনা যেমন বহুদূর যাত্রার পরে একদিন সহসা বিপুলধারা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া ধন্য হইয়াছে, পুণ্য হইয়াছে, তেমনি আমাদের বাংলাদেশের বিজয়া-মিলন বহুকাল পরে আজ একটি দেশপ্লাবী সুবৃহৎ ভাবস্রোতের সহিত সংগত হইয়া সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল। আজ হইতে এই উভয় ভাবধারা যেন মিলিত গঙ্গাযমুনার মতো আর-কোনোদিন বিচ্ছিন্ন না হয়।

আজ হইতে বাংলাদেশে ঘরের মিলন এবং দেশের মিলন এক উৎসবের মধ্যে আসিয়া সংগত হয়। আজ হইতে প্রতি বৎসরে এই দিনকে কেবল বান্ধবসম্মিলন নহে আমাদের জাতীয় সম্মিলনের এক মহাদিন বলিয়া গণ্য করিব। ...

...বন্ধুগণ, এতদিন স্বদেশ আমাদের কাছে একটা শব্দমাত্র, একটা ভাবমাত্র ছিল—আশা করি, আজ তাহা আমাদের কাছে বস্তুগত সত্যরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, যাহাকে আমরা সত্যরূপে না লাভ করি তাহার সহিত আমরা যথার্থ ব্যবহার স্থাপন করিতে পারি না, তাহার জন্য ত্যাগ করিতে পারি না, তাহার জন্য দুঃখ স্বীকার করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। তাহার সম্বন্ধে যতই কথা শুনি, যতই কথা কই, সমস্তই কেবল কুহেলিকা সৃষ্টি করিতে থাকে। এই-যে বাংলাদেশ ইহার মৃত্তিকা, ইহার জল, ইহার বায়ু, ইহার আকাশ, ইহার বন, ইহার শস্যক্ষেত্র লইয়া আমাদিগকে সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আছে — যাহা আমাদের পিতা-পিতামহগণকে বহুযুগ হইতে লালন করিয়া আসিয়াছে, যাহা আমাদের অনাগত সন্তানদিগকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, যে কল্যাণী আমাদের পিতৃগণের অমর কীর্তি অমৃতবাণী আমাদের জন্য বহন করিয়া চলিয়াছে, আমরা তাহাকে যেন সত্য পদার্থের মতোই সর্বতোভাবে ভালোবাসিতে পারি — কেবলমাত্র ভাবরসসম্ভোগের মধ্যে আমাদের সমস্ত প্রীতিকে নিঃশেষ করিয়া না দিই। আমরা যেন ভালোবাসিয়া তাহার মৃত্তিকাকে উর্বরা করি, তাহার জলকে নির্মল করি, তাহার বায়ুকে নিরাময় করি, তাহার বনস্থলীকে ফলপুষ্পবতী করিয়া তুলি, তাহার নরনারীকে মনুষ্যত্বলাভে সাহায্য করি। যাহাকে এমনি সত্যরূপে জানি ও সত্যরূপে ভালোবাসি, তাহাকেই আমরা সকল দিক দিয়া এমনি করিয়া সাজাই সকল দিক হইতে এমনি করিয়া সেবা করি এবং —

... হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া-সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করো। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত নদীজালজড়িত পূর্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত করো। যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখা-প্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও, আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচি রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম্' গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক — একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো —

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।।

বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।।

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।।

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।।"

সবপেয়েছির আসরকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে

ডঃ রমেশ চন্দ্র বসু
কার্য্যকরী সভাপতি

প্রতিষ্ঠাতা স্বপন বুড়োর (শিশু সাহিত্যিক অখিল নিয়োগী) হাতে ১৯৪৫ সালে গড়ে ওঠা সবপেয়েছির আসর আজ শৈশব ও কৈশোর কাটিয়ে ৬০ বছরের প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছে, সঙ্গে স্বীকৃতি লাভ করেছে সর্বভারতীয়, সুপ্রাচীন, সুবৃহৎ শিশু ও কিশোর কল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে। আস্থা অর্জন করেছে আপামোর জনসাধারণের। আজ সবপেয়েছির আসরকে সরকারী দপ্তর, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, রোটারী-লায়ন্স-এর মত আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কাছে আর পরিচিত করাতে হয় না, এর ব্যাপ্তি ঘটেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে, সুদূর নেপাল ও বাংলাদেশের শিশুকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছেও সবপেয়েছির আসর এক অতি পরিচিত আদর্শ শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

সবপেয়েছির আসরের দৈনন্দিন কর্মসূচীর সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থেকে একটা বিষয় উপলব্ধি করতে পারছি যে বর্তমান যুগের প্রগতির সঙ্গে শিশু-কিশোরদের আকাঙ্খা পূরণে এই সংগঠনের রুটিন কর্মধারার পরিবর্তনের কিছুটা প্রয়োজন। হাজারো শিশুমনের চাহিদা মেটাতে কেবলমাত্র সমবেত ব্যায়াম, বৃন্দগান, ছড়া, আবৃত্তি, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, ভঙ্গীগীতি, ব্রতচারী, খো খো, কাবাডি ছাড়াও আরও কিছু বিষয় ভাবতে হবে যাতে করে আরও অনেক শিশু-কিশোরকে আকৃষ্ট করা যায়, নচেৎ প্রতিদিন আসরের মাঠে জমায়েত, ১ দিন বা ২ দিনের স্থানীয় ও আঞ্চলিক শিবির, বাৎসরিক সোনারকাঠি বা দ্বিবার্ষিক কর্মী শিবিরের আয়োজনের মাধ্যমে এই সংগঠনের কর্মধারা অব্যাহত রাখা কঠিন হয়ে উঠবে।

সবপেয়েছির আসরের পরিধির বাইরে অন্যান্য শিশুসংগঠন বা ছাত্র ও যুব সমাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে উপলব্ধি করতে পারছি, সবপেয়েছির আসরের সঙ্গে যুক্ত সোনারকাঠি ভাইবোনেদের বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, এই ধরণের কিছু কিছু কর্মসূচীর সঙ্গে সবপেয়েছির আসরের যোগসূত্র ঘটানো ও আরো ব্যাপকতার প্রয়োজন আছে।

১) বিগত ১২ বৎসর যাবৎ ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তরের পরিবেশ সচেতনতার কর্মসূচীর (Natural Environmental Awareness Campaign - NEAC) সঙ্গে যুক্ত হয়ে কয়েকটি আসরের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মূলকেন্দ্র ইতিমধ্যে ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তরের প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছে। আরও আন্তরিকতা ও ব্যাপকতার সঙ্গে অনেক বেশি আসরকে এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

২) বিগত ১৩ বছর ধরে আঞ্চলিক, জেলা, রাজ্য ও পরিশেষে জাতীয় পর্যায়ে শিশুবিজ্ঞান কংগ্রেস অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে আয়োজিত হয়ে চলেছে ১০ থেকে ১৬ বৎসরের লক্ষ লক্ষ শিশু ও ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। সবপেয়েছির আসরের সবকটি শাখার এই ধরণের শিশুদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। কেননা, বেশ কিছু সংখ্যক অভিভাবক এই ধরণের কর্মসূচীতে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের অংশগ্রহণে আগ্রহী।

৩) ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে গত ২০০৪ সালে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় সকলের জন্য বিজ্ঞান শীর্ষক বিজ্ঞান সচেতনতা বর্ষ সারা ভারতবর্ষব্যাপী আয়োজিত হয়েছিল। সবপেয়েছির আসরের হুগলী, বীরভূম ও নদীয়া জেলার বেশ কিছু আসর অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে বর্ষব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জাতীয় স্তরে খ্যাতি লাভ করেছে। সবকটি জেলার আরও ব্যাপক সংখ্যক আসরের এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। ভবিষ্যতে আরও কচিকাঁচাদের আকৃষ্ট করার জন্য এই সকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের একান্ত প্রয়োজন।

৪) তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে কম্পিউটারের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত হতে না পারলে যুগের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখা কঠিন হয়ে উঠবে। তাই যে সকল আসরের পক্ষে সম্ভব সপ্তাহে অন্তত একদিন বা দুদিন যদি সোনারকাঠি ভাই-বোনেদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় তবে বেশ কিছু সোনারকাঠি আকৃষ্ট হতে পারে, যেমন নবমিতালি সবপেয়েছির আসর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়ার

মাধ্যমে বেশ কিছু সোনারকাঠি ভাই-বোন ও ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করতে পেরেছে।

৫) আজকাল বেশীর ভাগ অভিভাবকদের আগ্রহ তাদের পুত্র-কন্যাদের গতানুগতিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়াও অঙ্কন, নাচ, গান, বাজনা, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদি যে কোন বিষয়ে তালিম দেওয়ার ব্যবস্থা করায়। এই ব্যাপারে কোলকাতার জহর শিশু ভবন বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ মুষ্ঠিমেয় কয়েকজনের প্রচেষ্টায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শত সহস্র শিশুদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে, ১৬ বৎসর পর্যন্ত শিশু কিশোর শিক্ষার্থীর কখনো তাদের অভাব হয় না। সবপেয়েছির আসরও কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিকভাবে বা কোনো বলিষ্ঠ আসরের মাধ্যমে আগামীদিনের এই ধরণের কর্মসূচীর পরিকল্পনা নিতে পারে।

৬) বেশ কিছু অভিভাবক ও শিশু দরদীদের সমর্থন ও সহযোগিতায় আঞ্চলিকভাবে বা কেন্দ্রীয়ভাবে, সম্ভব হলে বেহালা কেন্দ্রীয় শিশুভবনে শিশুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে যা সরকারীভাবে এবং বিভিন্ন বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী-প্রতিষ্ঠানের অকুণ্ঠ সমর্থন পাবে যেটা সমাজের আশু প্রয়োজন।

৭) সবপেয়েছির আসরের যেটা সবথেকে বর্তমান সমস্যা সেটা হল একনিষ্ঠ কর্মী ও প্রশিক্ষকদের অভাব। বর্তমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে ও অর্থনৈতিক সমস্যায় ও বেকারত্বের জ্বালায় বেশ কিছু কর্মী ভাই-বোন হতাশাগ্রস্থ। এই সকল দক্ষ কর্মীদের স্বল্পকালীন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে উৎসাহিত করা যেতে পারে। সবপেয়েছির আসর আয়োজিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মী ভাই-বোনেরা স্বাবলম্বীতা অর্জন করে বিভিন্ন শাখা আসর পরিচালনা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালনে আরও সচেষ্ট হতে পারে।

আরও বেশি সংখ্যক শিশু কিশোর কিশোরীদের ঐতিহ্যময় সবপেয়েছির আসরের প্রতি আকৃষ্ট করতে ও আগামীদিনে আরও ব্যপ্তির জন্য উপরি উল্লিখিত বেশ কয়েকটি পরিকল্পনার উল্লেখ করলাম ক্রমান্বয়ে যার অন্তত কয়েকটি বাস্তবরূপ পেলে সুপ্রাচীন সকলের প্রিয় এই শিশু প্রতিষ্ঠান আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে বলে আশা রাখি। আগামী ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৫ হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান সবপেয়েছির আসরের সঙ্গে যুক্ত সকল সোনারকাঠি ভাইবোন, কর্মীবৃন্দ, অভিভাবক ও শিশুদরদীদের সমর্থন ও সহযোগিতায় সম্পন্ন হোক এটাই একান্ত কাম্য।

যেন ভুলে না যাই . . . .

অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়
সভাপতি, সবপেয়েছির আসর

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের একটি দিন। বৃটিশ শাসিত ভারতের রাজধানী কলকাতার একটি আদালতে বিচার চলছে। আদালতের বাইরে কৌতূহলী জনতার কলরব। মনে হয় তাদের কোনো জাতীয় নেতার পরিণতি জানার জন্য তারা উদ্‌গ্রীব। ভেতরে নিস্তরঙ্গ নীরবতা, পরিবেশ ভারাক্রান্ত। কেন? কারণ এ এক বিরল বিচারসভা। মহামান্য বিচারক অবশ্যই সাগরপারের মানুষ। মাননীয় জুরিবৃন্দও স্বভাবতই সাদা চামড়ার বিজ্ঞজন। কিন্তু আসামী কে? তিনি জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক, ইংল্যান্ড থেকে আগত গির্জায় নিযুক্ত এক সুপণ্ডিত ধর্মযাজক। কী তাঁর অপরাধ? অপরাধ গুরুতর। তিনি ইংরেজ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছেন। কীভাবে? সেই কাহিনী সংক্ষেপে এইরকম—

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হল বাঙালীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক 'নীলদর্পণ'। প্রথমে বেনামে প্রকাশিত হলেও আমরা জানি লেখকের নাম দীনবন্ধু মিত্র। এই নাটকের উপজীব্য ছিল বাংলার গরীব নীলচাষিদের ওপর নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার ও সীমাহীন শোষণের কাহিনী। চাষিদের অসহায় জীবনের করুণ চিত্র এবং সাহেবদের নানাবিধ পীড়ন ও অনাচারের ঘটনাবলী জীবন্ত ও বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল নাটকের প্রতি দৃশ্যে, প্রতিটি সংলাপে। বাস্তবের এই বলিষ্ঠ উদ্‌ঘাটনে সাড়া পড়ে গিয়েছিল বাংলার ঘরে ঘরে। একবার স্টার রঙ্গমঞ্চে নীলদর্পণের অভিনয় চলাকালীন একটি বিশেষ ঘটনা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। নাটক দেখতে এসেছেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। নাটক বেশ জমে উঠেছে। সাহেবের অত্যাচারের দৃশ্য দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন বিদ্যাসাগর। চরম দৃশ্যে নিজের পা থেকে একপাটি চটি খুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে দিলেন মঞ্চে 'সাহেবের' উদ্দেশ্যে। সেই লম্পট সাহেবের চরিত্র এমন প্রাণবন্ত অভিনয়ে যিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর নাম অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি। তিনি সেই পাদুকা মাথায় তুলে নিয়ে বললেন — এ আমার অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি, অমূল্য পুরস্কার।

বিচারাধীন ইংরেজ যাজকের বিরুদ্ধে নালিশ ছিল এই নীলদর্পণকে ঘিরে। ধর্মপ্রচারক হিসেবে তিনি বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন, মানুষের কাছে যেতেন। তাঁর নিজের দেশের 'সভ্য' মানুষরা দরিদ্র চাষিদের ওপর যে অন্যায় নিপীড়ন চালাতো তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, ব্যথিত হয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর স্বজাতীয়দের এমন ঘৃণ্য আচরণ অব্যাহত থাকলে এদেশের মানুষের কাছে খৃষ্টধর্মের মহিমা প্রচার সম্ভব হবে না। সে সময় নীলচাষ সংক্রান্ত যে কমিশন বসেছিল তার সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি নিজের এই অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, গ্রামের মানুষের কাছে মুখ দেখাতে তাঁর লজ্জা করে। অসহায় চাষির দল তাঁকে বলে — পাদ্রী সাহেব, ধর্মের কথা আমাদের পরে শেখাবেন। আগে আপনার দেশের নীলকরদের এই অত্যাচার কমাবার শিক্ষা দিয়ে আসুন।

নিজের এই অভিজ্ঞতার মর্মস্পর্শী প্রকাশ তিনি দেখতে পেলেন নীলদর্পণে। প্রতিজ্ঞা করলেন, এই কদর্যতার কাহিনী পৌঁছে দেবেন ইংরেজ সমাজে। বিশেষ যত্ন নিয়ে তিনি এই নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করলেন, সঙ্গে যোগ করলেন একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা। এই বই প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল স্বার্থান্ধ বেনিয়া ইংরেজ মহল। ইংরেজ হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে এমন কথা বলার স্পর্ধা যিনি দেখিয়েছেন তাঁকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়ল সেই লুঠেরার দল ও তাদের পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ। সংবাদপত্রে নামল উন্মত্ত প্রচারের ঢল। রুজু করা হল মানহানির মামলা। সেই মামলার বিচারের কথাই বলা হয়েছে এই লেখার সূচনায়। বিচারের নামে কয়েকদিন প্রহসন চলার পরে অভিযোগ প্রমাণিত হল। সেই অনুবাদক দোষী সাব্যস্ত হলেন। শাস্তি হল একমাস কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা।

'এই নাও তোমাদের জরিমানার টাকা'— বজ্রকণ্ঠের হুঙ্কারে সচকিত হল আদালত কক্ষ। সমবেত মানুষ চেয়ে দেখলেন, তৎক্ষণাৎ এক হাজার টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন সেকালের বাংলার অগ্রণী বুদ্ধিজীবী ও জমিদার কালীপ্রসন্ন সিংহ। জরিমানার পালা চুকে গেল। কিন্তু উদার মানবতাবাদী সেই 'অপরাধীকে' সত্য ভাষণের মূল্য হিসেবে এক মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হল। তবে তিনি বাঙালীর কত কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর বন্দিদশার মাসটি জুড়ে। মানুষের ক্ষোভ ও দুঃখ ফুটে উঠল অনেক সভা-সমাবেশে। কর্তৃপক্ষের কাছে বেশ কিছু স্মারকলিপি দেওয়া হল। তিনি নিজে পেলেন শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিতে আপ্লুত অজস্র চিঠি। জেল থেকে তাঁর মুক্তির ক্ষণে

এই বিদ্রোহী বন্ধুকে দেখার জন্য লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল পথঘাট। শুধু তাই নয়। এই ঘটনার সূত্রে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল প্রতিবাদের ঝড় যা আমাদের জাতীয় চেতনাকে ব্যাপ্ত ও সংহত করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল।

কিন্তু কে এই ধর্মযাজক? কী তাঁর পরিচয়? তাঁর নাম রেভারেন্ড জেমস্ লং। এই সেই ভারতপ্রেমী মহান ব্যক্তি যাঁর নামাঙ্কিত সরণিতে গড়ে উঠেছে সবপেয়েছির আসরের কেন্দ্রীয় শিশুভবন, শ্রদ্ধেয় স্বপনবুড়োর স্বপ্নের রূপায়ন। এখানে আমরা বিবিধ অনুষ্ঠান করি, সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ চালাই, আর রোটারী ক্লাবের বড়িশা শাখার সঙ্গে যুগ্মভাবে পরিচালনা করি ছোটদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার কেন্দ্র।

জেমস্ লং-এর জন্ম হয়েছিল ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ডে। ১৮৪০ সালে তিনি কলকাতায় আসেন ধর্মযাজকের দায়িত্ব নিয়ে। প্রথম দিকে কিছুদিন তিনি মির্জাপুর স্ট্রীটের একটি বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। পরে তাঁর কাজের কেন্দ্র হয় বেহালার দক্ষিণে আমাদের অতিপরিচিত ঠাকুরপুকুর যা তখন ছিল একটি গ্রাম। এখানে তিনি দীর্ঘ তিরিশ বছরেরও বেশি কাজ করেন।

মানুষের প্রতি ভালবাসা জেম্স্ লং-এর ছিল গভীর ও অকৃত্রিম। তিনি এদেশের মানুষকেও অন্তরের সঙ্গে ভালবেসেছিলেন। খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজে তিনি বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশেছেন। তাদের জীবনযন্ত্রণা তাঁকে বিচলিত করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন এই বঞ্চিত মানুষদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে হলে তাদের ভাষা আয়ত্ত করা একান্তভাবে প্রয়োজন। এই চিন্তা থেকেই তিনি কয়েকটি ভারতীয় ভাষার-চর্চা শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত ও বাংলাসহ বেশ কিছু আঞ্চলিক ভাষা শিখে ফেলেন। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ জন্মেছিল। এই ভাষার উন্নতির জন্য তিনি বেশ কিছু মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। বাংলাদেশের গ্রামে-শহরে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে লং সাহেব তাদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ প্রবচনগুলিকে সযত্নে অনুধাবন করেন। এই প্রবচনগুলির গভীর দ্যোতনা ও সরস স্পষ্টতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রবাদবাক্য সংগ্রহ করে তিনি ১৮৫১ সালে Bengali Proverbs নামে একটি সংকলন রচনা করেন। সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা এবং টীকাও যুক্ত করেন। তখনকার বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির লক্ষ্যে তিনি আরো কিছু মূল্যবান বই ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেই সময়ে কয়েকজন শিক্ষাবিদের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা সংস্কৃতের সর্বময় প্রভাব থেকে সরে এসে একটি স্বতন্ত্র রূপ নিচ্ছিল। লং এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এদেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জেমস্ লং নামটি জড়িয়ে আছে। ১৮৫৩ সালে তিনি 'বিবিধার্য সংগ্রহ' নামক পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঐতিহ্যশালী বেথুন সোসাইটি, বেঙ্গল সোস্যাল্ সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন্ এবং কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

জেমস্ লং-এর চরিত্র ছিল অদম্য উৎসাহ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চিন্তাভাবনায় তিনি ছিলেন প্রগতিশীল মানুষ। সঙ্কীর্ণ জাত্যাভিমান তাঁকে মানবপ্রেম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রশ্নে তিনি তাঁর দেশবাসীকেও ধিক্কার দিতে কুণ্ঠিত হননি। খৃষ্টধর্মের প্রতি আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁর কোনো বিদ্বেষ বা বিরূপতা ছিল না। তাঁর কাছে খৃষ্টধর্মের একটাই অর্থ ছিল — মানুষের প্রতি ভালবাসা।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের কালে কতিপয় ব্যতিক্রমী মানুষ ভারতে এসেছিলেন যাঁরা এদেশের দুর্গত জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। জেম্স্ লং ছিলেন তাঁদেরই একজন। আমরা কি এমন মহান ব্যক্তিকে ভুলে যেতে পারি?

তথ্যসূত্র ঃ-

1. Dictionary of National Biography — Volume II - Edited by S. P. Sen, Director, Institute of Historical Studies.
2. Encyclopaedia of the Indian Biography — Volume V - Edited by N. K. Singh.
3. বাংলাপিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ) — খণ্ড ৯ - প্রধান সম্পাদক ঃ সিরাজুল ইসলাম।

সাঁওতাল অভ্যুত্থানের দেড়শ' বছর

শ্রী অরুণ চৌধুরী

প্রবীণ শিক্ষকনেতা, বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং প্রাবন্ধিক

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ বণিকদের ব্যবসায়িক সংস্থা 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা দখলের দিকে দ্রুতপায়ে এগোতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় (১৮৬১-১৯৪১) 'বণিকদের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদন্ডরূপে'। ঐ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং পরবর্তীকালে ভারতের অধীশ্বর হবার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বণিকদের যে অভিযান তার দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল, ১৭৬৫ সনে দিল্লীর মোগল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার 'দেওয়ানী সনদ' সংগ্রহ করা। রাজার রাজত্ব বা যে কোনো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তার পরিচালনার জন্য অত্যাবশ্যক যে রসদ, তা হল অর্থ। সেই অর্থের উৎসগুলি হল, রাজকীয় বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখার প্রধান ভরসা অথবা অবলম্বন। রাজা বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ভাণ্ডার যদি শূণ্য হয়ে যায়, তাঁর কোষাগারে যদি বুভুক্ষু ইঁদুরের আধিপত্য কায়েম হয়, তবে রাজকীয় কর্তৃপক্ষ দেউলিয়া হয়ে যাবেন। যার সর্বনাশা পরিণতি হল রাজ্যকে বা দেশকে অন্যের কাছে বন্ধক দেওয়া। ঘটি বাটি বিক্রি করা। যেমন, আশির দশকের শেষভাবে এককালের 'তরুণতুর্কি' বলে অভিহিত (এন্তলিহল ধনিক শ্রেণীর সংবাদপত্র এবং তাদের প্রচার যন্ত্রের রচিত ও ঘোষিত অভিধা) চন্দ্রশেখর 'একদিনকা সুলতান' হলেন। দেশে তখন আর্থিক ক্ষেত্রে ভীষণ সংকট। প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরজী দেশের কোষাগারে মজুত যত সোনা তা বিদেশের ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখলেন। বিগত শতকের আশির দশকের গোড়ায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেস (ই) দলের কৃতী (?) অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার শোচনীয়তা কাটাতে এবং দেশের অর্থনীতিকে 'চাঙ্গা' (!) করতে মাধুকরীতে গেলেন সামুচাচার দেশে। আই. এম. এফ.-এর কাছে ভারত ইউনিয়ন বন্ধক রাখার কড়ারে কিছু ডলার ঝোলায় নিয়ে ফিরলেন। তারপরের কি পরিণতি — সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, ফাও ব্যাঙ্কের আরেক সহোদর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সম্মিলিত উদ্যোগে ভারতের অর্থনীতির স্বয়ম্ভরতার গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের সার্বভৌমত্বও বিপন্ন।

কথায় কথায় অনেকদূর চলে এসেছি। এবার নির্দিষ্ট স্থানে ফেরা যাক।

রাজস্বের কর্তৃত্ব লাভে ব্রিটিশ বণিককুলের ভাগ্যতরির গতিবেগ আরও বাড়ল। পালে জোর হাওয়া লাগল। তখন ভূমিরাজস্বই ছিল রাজকীয় আয়ের প্রধান উৎস। শিল্প-বাণিজ্য থেকে আয়ের পরিমাণ বেশি ছিল না।

ব্রিটিশ বণিকরা রাজস্বের পরিমাণ বাড়াবার জন্য 'সুবে বাংলার'— বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাবার জন্য উদ্যোগী হল। পাঁচসালা, দশসালা বন্দোবস্ত করে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হল। তারপর লর্ড কর্ণওয়ালিশ গভর্নর জেনারেল হয়ে এসে সাময়িক বন্দোবস্ত বাতিল করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) করলেন। পুরানো জমিদাররা বাতিল হল। সব জমিদারি একে একে নিলামে উঠল। বেশি রাজস্ব দিবার কড়ারে পুরোনো জমিদারদের বিভিন্ন মহল বা জমিদারি এলাকা কিনে নিলেন ব্রিটিশ বণিককুলের ব্যবসা-বাণিজ্যের সহযোগী মুৎসুদ্দি বেনিয়ানরা। ওঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে বিত্তশালী হয়েছিলেন। ভারতের প্রথম পুঁজিপতি তাঁরা। চারিত্রিক বিচারে মুৎসুদ্দি-বুর্জোয়া।

নতুন জমিদাররা রাজস্ব বৃদ্ধির তাগিদে নতুন নতুন এলাকা বন্দোবস্ত দিয়ে মধ্যস্বত্বের জন্ম দিল। নতুনভাবে তৈরি হলেন বহু মধ্যস্বত্বাধিকারী। তালুকদার, পত্তনীদার, দরপত্তীদার, সে পত্তীদার প্রভৃতি পরপর অনেকগুলি থাক তৈরি হল।

অবিভক্ত বাংলার বাখরগঞ্জ জেলায় এভাবে মোট ১৮টি থাক তৈরি হয়েছিল।

জমিদারদের এলাকা ও সরকারি কোষাগারে দেয় রাজস্ব সবই 'চিরস্থায়ী' ছিল। ঐ স্থিরিকৃত এলাকায় জমিদাররা প্রজাস্বত্ব বা মধ্যস্বত্বাধিকারীদের কাছ থেকে খাজনা বাবদ যা আদায় করবেন, তার মোট দশভাগের নয়ভাগ দিতে হবে সরকারী কোষাগারে। বাকী এক ভাগ তাঁদের প্রাপ্য। কিন্তু নির্দিষ্ট এলাকা, যা মহল বা মহান নামে অভিহিত তাতে নির্ধারিত যে সমগ্র এলাকা, তাতে নতুনভাবে প্রজাপত্তন করে জমিদারদের প্রাপ্য বাড়াবার অবাধ অধিকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল। এখানেই হল জমিদারদের পোয়া বারো। তাঁরা প্রজার দেয় খাজনা যদৃচ্ছভাবে বাড়িয়ে নিজেদের আয় বাড়াতেই লাগলো। এদিকে, ঐ আদায়ীকৃত অংশের কোনো অংশ প্রজাদের স্বার্থে অর্থাৎ কৃষির জন্য সেচের সুযোগ বৃদ্ধি তার দেখভাল করা। ফসল বাজারে নিয়ে যাবার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা বাড়ানো ও উন্নত করা এবং তারও রক্ষণাবেক্ষণ, প্রজাবর্গের

শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক জীবনের মানোন্নয়ন, তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা, — এর কোনোটারই দায়িত্ব ছিল না ঐ সব জমিদারদের। তাঁরা থাকতেন শহরে। কাছেই, গ্রামের সাথে তাঁদের কোনো নিয়মিত সম্পর্ক বা যোগাযোগ রইল না। কাজেই, তাঁরা হলেন অনুপস্থিত জমিদার। কবি নজরুলের ভাষায় — 'জমিতে যাঁদের পড়ে না চরণ,' সেই জাতীয় ব্যক্তিরাই 'জমিদার' হলেন।

নবাবী আমলের জমিদারদের চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। তাঁরাও শোষক ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কৃষকরূপী রাজহংসের স্বর্ণডিম্বও খেতেন। কিন্তু বেশি করে স্বর্ণডিম্ব পাবার প্রত্যাশায় রাজহংসের পেট চিরতেন না। কৃষির জন্য সেচ ব্যবস্থা, পূর্তকার্যের উন্নতির বিষয়ে লক্ষ্য রাখতেন। কার্ল মার্কস (১৮২০-৮৩) তাঁর ভারত সম্পর্কিত প্রবন্ধরাজিতে (১৮৫৩)এই সব জমিদারদের 'বেনিভোলেন্ট ডেস্পট' বলে অভিহিত করেছেন।

আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে জমির প্রকৃত মালিক ছিলেন কর্ষণকারী বা কৃষকরা। তাঁরা পুরুষানুক্রমে জমির ভোগ দখল করতেন। তার জন্য 'রাজা'-কে রাজস্ব' হিসাবে দিতেন জমির ফসলের এক ষষ্ঠাংশ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তা বরবাদ হল।

জমি কেবল ভোগ দখলের সামগ্রি ছিল। কিন্তু পণ্য বলে গণ্য হল না। কেনাবেচা চালু ছিল না। ব্রিটিশ ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি ব্রিটিশ বণিককুল এবং তাঁদের ব্যবসায়িক সংস্থা — ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সেই জমিতে পরিণত হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভূমি ব্যবস্থার সবরকম নিষ্কর ব্যবস্থা বা লাখেরাজ খারিজ হয়ে গেল। চাকরণ জমি, নানকর জমি প্রভৃতি নানাবিধ নিষ্কর ব্যবস্থার অবসান হল।

এই সব মিলিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে ও পরে 'সুবে বাংলা'র কৃষকদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হল। মান্ধাতার আমলের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ ভূমি ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনে দ্রুত ভেঙে পড়তে লাগল। সমাজ জীবনে তার দারুণ প্রভাব পড়ল। আবহমানকালের একটা ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে সামাজিক দ্বন্দ্বগুলো অনিবার্য কারণে বৃদ্ধি পায় এর জোর আঘাত লাগল কৃষি ও তার সহযোগী কুটির শিল্পের উপর। উৎপাদন ব্যবস্থার গায়ে জোর ধাক্কা লাগল।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বের অনেক অদল-বদল, বাইরে থেকে বহু জনগোষ্ঠী এসেছে। মিলন-মিশ্রণ হয়েছে। বহু বহিরাগত বহু মানুষ আক্রমণকারীর বেশে এসেছে। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হয়েছে। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার যে ভারতীয় বিশেষরূপ তা যথাযথ এবং অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছে। ঘটেনি তার রূপান্তর। সেখানে মান্ধাতার আমল বজায় থেকেছে। 'শক হুণদল পাঠান মোগল' কেউ এদিকে বিশেষ নজর দেয়নি। মোগল আমলে কিছু ভাবনা চিন্তা হল। রাজস্ব আদায়ের পরিকাঠামোর কিছু ঘষামাজা হল। কিন্তু কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার চিরাচরিত রূপ অবিকৃত ও অক্ষত থেকে গেল।

কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের ধনতান্ত্রিক ভাবনা চিন্তা, ধনিকশ্রেণীর শ্রেণীগত স্বার্থ এবং উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের কথা মাথায় রেখে ভূমি ব্যবস্থার ধনতান্ত্রিককরণের একটা অভূতপূর্ব পদক্ষেপ নিল। ধনিকশ্রেণীর শ্রেণীগত স্বার্থে কৃষককে অধিকার দেবার কথা। কিন্তু এখানে তার অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। আবহমানকাল যে কৃষক ছিল জমির মালিক, তা কেড়ে নেওয়া হল। এ বিষয় আগেই উল্লেখ করেছি। তৈরি হল এক হাঁসজারু ভূমিনীতি।

ব্রিটিশ শাসনের শুরুতেই হল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। (বাংলা ১২৭৬, ইং ১৭৭০), সুবে বাংলা শ্মশানে পরিণত হল। সম্পন্ন গৃহস্থ মহেন্দ্র কল্যাণীরাও ভদ্রাসন ত্যাগে বাধ্য হল। (বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ)। কৃষক বিদ্রোহের শুরু এখান থেকেই। মজনুশাহ ফকির, ভবানী পাঠকরা (দেবী চৌধুরাণী) অস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। আঠারো শতকের সত্তরের দশকে শুরু হল ফকির বিদ্রোহ ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। উনিশ শতকে বাঁশের কেল্লা তৈরি করে লড়াই করলেন তিতুমীর (১৮৩০-৩১)। তারপর দুদুমিঞার নেতৃত্বে ফরাজী বিদ্রোহ। বিদ্রোহের ধারা অব্যাহত (উনিশ শতকের প্রথমার্ধে)।

এইসব কৃষক বিদ্রোহের ক্ষেত্রে সর্বাধিক আগুয়ান ছিলেন ভারতবর্ষের উপজাতীয় মানুষরা। সমগ্র পূর্ব ভারতে এর সূচনা। তার ব্যাপ্তি ঘটেছিল তৎকালীন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির আরব সমুদ্র পর্যন্ত মোপলা বিদ্রোহ তার অন্যতম নজির।

পূর্ব ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম প্রভাত, ব্রিটিশ ধনিক শ্রেণীর ভাগ্য গগনের সূর্যোদয়। তার উপনিবেশের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে ভারত তার বিজয়াভিযানের সূত্রপাত। সেই কারণে, জনজীবন, যার অন্যতম অংশ বা প্রধান অংশ কৃষক সমাজ, তাদের মধ্যে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। যার কারণ আগে উল্লেখ করেছি। পূর্বভারতের কৃষক বিদ্রোহগুলির তালিকা সুদীর্ঘ। আসামে গারোদের নানা বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে সিংভূমের কোলবিদ্রোহ (১৮৩৩) হো বিদ্রোহ (১৮৩৩ থেকে) মুন্ডা জনাগোষ্ঠীর পরপর অনেকগুলি বিদ্রোহ, যার একটা চূড়ান্ত রূপ এবং বেগবতী ধারা দেখা গেল বীরসা মুন্ডার (১৮৭৩-১৯০১)নেতৃত্বে সংগঠিত মুন্ডা

বিদ্রোহ। যার নাম 'উলগুলার্ণ'। বীরসার জীবনাবসান হয়েছিল ১৯০১ সনে। তারপরেও ঐ বিদ্রোহের ভগ্নাবশেষ থেকে ধোঁয়া উঠেছে প্রাক্-স্বাধীনতাকাল পর্যন্ত। বীরসা-র অনুগামীদের নাম হয়েছিল 'বীরসাইট' বা 'বীরসা পন্থী'। ১৯৪২-এর আন্দোলনেও বীরসাপন্থীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল।

সাঁওতাল উপজাতির ঐতিহাসিক বিদ্রোহ ঘটেছিল ১৮৫৫ সনে। যার কথা পরে লিখব। তার ধারাও অব্যাহত ছিল প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ পর্যন্ত। পরবর্তীকালে অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তরকালে ভূমির আন্দোলনে নতুনরূপ নিয়েছে। দেখা দিয়েছে মতাদর্শভিত্তিক সংগঠন। সামন্ততন্ত্র বনাম কৃষকের সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে।

সাঁওতাল বিদ্রোহের দেদীপ্যমান বহ্নিশিখা নিভেও নেভেনি। সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশিক শোষণ, জমিদার ও মহাজনদের শোষণ এবং তার সাথে মিলিয়ে উপজাতীয়দের জীবনের অবমূল্যায়ন ও নিপীড়ন, এসব যতদিন বজায় থাকবে, বজায় থাকবে আজকের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যুগে ভারতীয় বৃহৎ পুঁজির মালিকগণসহ আন্তর্জাতিক বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির বহুমাত্রিক শোষণ কৃষক সমাজ তা মেনে নিতে পারে না। বলা বাহুল্য, এইসব শোষণের প্রধান শিকার হল উপজাতীয় জনগণ। কেননা, তাঁরা হলেন গ্রামীণ সর্বহারাদের প্রধান অংশ। তাই, তাঁদের জীবনেই ধাক্কাটা সর্বাধিক।

১৮৫৫ সনের সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনী এবং তার কথা বিশাল। কাজেই, স্বল্প পরিসরে তা তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। ঐ বিদ্রোহ, সাঁওতালী ভাষায় 'হুল' নামে অভিহিত, তার মূল কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর নির্মম ও অমানুষিক ঔপনিবেশিক শোষণ। আর তাদের গ্রামীণ খুঁটি বা স্তম্ভ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাসাদপুষ্ট নতুন জমিদার শ্রেণী ও মহাজনরূপী ডাকাতদের শোষণ। শোষণের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে নির্মমতা ও অমানুষিকতা। জড়িত থাকে নিপীড়ন ও অত্যাচার। এককথায় সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ। ওটা হল শোষকশ্রেণীর শোষণব্যবস্থা বজায় রাখার অন্যতম অবলম্বন বা হাতিয়ার। কাজেই, মেহনতী মানুষদের বাঁচার তাগিদে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে। ঐ ধরণের অবজেকটিভ কণ্ডিসন বা বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনরূপ সাবজেকটিভ কন্ডিসন বা মন্ময় অবস্থা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি সুসম্পন্ন হলেই ঐ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে আন্দোলন বা সংগ্রামের মাধ্যমে।

১৮৫৫ সনের ৩০শে জুন থেকে নির্যাতিত, নিপীড়িত এবং সাম্রাজ্যবাদীদের মাত্রাহীন ঔপনিবেশিক শোষণ, তাদের প্রশ্রয়পুষ্ট ও তাদের দ্বারা-সুরক্ষিত জমিদার এবং মহাজনদের শোষণে দেয়ালে পিঠ ঠেকা সাঁওতাল উপজাতির মানুষরা ভগ্নাডিহি গ্রামে দশহাজার নরনারীর এক বিশাল সমাবেশ ঘটিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের কাছে প্রতিকারের দাবী নিয়ে অভিযান করেছিলেন। অবশ্য, এর প্রস্তুতি চলেছিল বছর খানেক আগে থেকে। কিন্তু এই অভিযানের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হল ৭ই জুলাই। ঐ থেকে তা সুস্পষ্ট বিদ্রোহে পরিণত হল।

ঐ বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলা যেতে পারে সমগ্র সাঁওতাল সমাজ, আর তাঁদের সহযাত্রী ও সহযোদ্ধা হয়েছিলেন অ-উপজাতীয় গ্রামীণ সমাজের নীচুতলার মানুষরা। কামার-কুমোর-তাঁতী-জোলা-গোয়ালা, দোসাদ প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষরা লড়াই করলেন আধুনিক অস্ত্রে— রাইফেল, কামান প্রভৃতিতে সুসজ্জিত ও যুদ্ধ বিদ্যায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্রিটিশ বাহিনীর সাথে। যার সৈনাপত্যে ছিলেন লয়েড, জার্ভিস, বার্ড প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সেনানায়করা। ঐ বাহিনীকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করল নীলকর ও রেললাইন পাততে আসা ঠিকাদাররা। মানসিক সমর্থন ছিল খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক মিশনারীদের। আর পাকুরহেতমপুর, মহেশপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদার পরিবার। মুর্শিদাবাদের নবাবসহ আরও ছোটবড় জমিদার পরিবার তাদের সাধ্যানুযায়ী যোদ্ধা পাঠাল, হাতী পাঠাল, রসদ যোগাল। আশ্রয়ের ব্যবস্থা করল বিভিন্ন এলাকার জমিদার ও মহাজনকূল এবং ব্যবসায়ীরা। এককথায়, সমগ্র শোষক শ্রেণী তাদের প্রাণভোমরার সংরক্ষক ছিল যে ব্রিটিশ শাসকরা। দু-একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল। তবে, তা খুবই কম। একমাত্র রাজনগরের জমিদারি-হারা মুসলিম 'রাজপরিবার'কে ঐ পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। আর কোনো নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়নি। আছে কিনা জানিনা।

১৮৫৫ সনের জুন থেকে আরম্ভ করে ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত অর্থাৎ আটমাস যাবৎ বিদ্রোহের বহ্নিশিখা জ্বলেছে। তারপর ঐ বহ্নিশিখার আগুন যে নিভে গিয়েছিল তা বলা যাবে না। তার দুই বছর পরেই হল 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে খ্যাত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। ঐ সংগ্রামের সাথে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে কিনা কিংবা সাঁওতাল উপজাতির মানুষরা তাতে অংশ নিচ্ছেন কিনা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। এখনও এ অধ্যায় অনাবিষ্কৃত। কিন্তু সম্পর্ক থাকা কোনো বিচিত্র বা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সিংভূম জেলা ও ছোটনাগপুরের হো উপজাতির মানুষরা কিন্তু ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নায়ক কোঁয়ার সিং বা কুমার সিং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রামের শরিক হয়েছিলেন।

Acc No – 16179

আরেক দিকও লক্ষ্যনীয়। উনিশ শতকের ষাটের দশক, সত্তর ও আশির দশকেও উপনিবেশিক শোষণ ও নিপীড়ন এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রশ্রয়-পুষ্ট জমিদার-মহাজন তথা সামগ্রিকভাবে সামন্তশ্রেণীর শোষণ অত্যাচার ও অমানুষিকতার বিরুদ্ধে ফের সংগ্রামের প্রস্তুতি করেছেন সাঁওতাল উপজাতির মানুষরা। ষাটের দশকের প্রথমভাগে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের ধরা-না-পড়া একটি গ্রুপ নদীয়ার নীল বিদ্রোহীদের (১৮৬০) সাথে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য কৃষ্ণনগরে হাজির হয়েছিলেন। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে নীল বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত ইন্ডিগো কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দানকালে একজন বিদ্রোহের শরিক নীল চাষী তাঁদের বিদ্রোহের মানসিকতার গঠনে ১৮৫৫-এর সাঁওতাল বিদ্রোহের সুমহান সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৩১-৩২ সনে মালদহে জিতু সাঁওতালের নেতৃত্বে স্থানীয়ভাবে এক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। শহীদ জিতু ও তাঁর সহযোদ্ধা ও বিদ্রোহের পরিকল্পকরা 'সাঁওতালরাজ'-এর কথা ঘোষণা করেছিলেন। ঐ বিদ্রোহেরও মূল চরিত্র ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও জমিদার-মহাজন তথা সামন্ততন্ত্র বিরোধী।

সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল সংগঠকদের মধ্যে সিধো কানুহসহ অনেকেরই ফাঁসি হয়েছিল। ঐসব ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল প্রকাশ্যভাবে। অনেকের ফাঁসি হয়েছিল গাছে ঝুলিয়ে। অর্থাৎ গণফাঁসি। সিউড়ি, রাজনগর, জঙ্গিপুর, দুমকা, ভাগলপুর প্রভৃতি নানা প্রশাসনিক কেন্দ্রে ও গুরুত্বপূর্ণস্থানে। জেলে পোরা হয়েছিল সহস্রাধিক মানুষকে। অনেককে পাঠানো হয়েছিল সুদূর ব্রহ্মদেশের মৌলমিন, মান্দালয় প্রভৃতি স্থানের কারাগারে। দেশের ভিতরে সিউড়ি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, আলিপুর প্রভৃতি স্থানের জেলখানাতেও অনেকে দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। তবে, তাঁরা কতজন তাঁদের কারামুক্তি আদৌ হয়েছে কিনা, হলেও কখন হয়েছে, এর কোনো খতিয়ান নেই। হয়ত আর কোনোদিন পাওয়া যাবে না। অসম যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা কত? এটিও চিরকাল হয়ত জিজ্ঞাসা চিহ্নে আবদ্ধ থাকবে। তবে ব্রিটিশ প্রশাসকদের লেখাজোখার উপর ভরসা করে বলা যায় যে নিহতের সংখ্যা হাজার বিশ পঁচিশও হতে পারে যাকে ব্রিটিশ সেনানায়ক মেজর জার্ভিস 'গণহত্যা' বলেই উল্লেখ করেছেন।

নামটা 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', আমার মতে, নিছক 'বিদ্রোহ' নয়। বলা যেতে পারে 'অভ্যুত্থান'। আর এই অভ্যুত্থিত মানুষদের নেতা হিসেবে সিধো-কানহু, বীর সিং, গোচ্চো বা শ্যাম পরগণায়েতরা হলেও এর শরিক অ-উপজাতীয় অংশের রেঙ্গেচ (গরীব) বা বেঙ্গাই হড়'রা। অষ্ট্রিক ভাষায় 'হড়' হল মানুষ। ব্রিটিশরা ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে ১৮৫৭-এর প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বক্ষণে পূর্বভারতের এই ঘটনা ছিল ব্রিটিশ শাসন বিরোধী এক রাজনৈতিক ভূকম্পন। এক সুপ্তআগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত।

এবার ঐ বিদ্রোহের দেড়শ বছর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কথা বাদ দিচ্ছি। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালেও ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রামের এই গৌরবময় অধ্যায় ভারতের ইতিহাসে কোনো গুরুত্ব পায়নি। এই স্বীকৃতি প্রথম দিয়েছেন কমিউনিস্টরা। ১৯৫৫ সালে বিদ্রোহের শতবর্ষ উদ্‌যাপন করেছে সারা ভারত কৃষক সভা। বামফ্রন্ট সরকার মর্য্যাদার সাথে উদ্‌যাপন করেছে ১২৫ বছর (১৯৮০)। এবার উদ্‌যাপিত হচ্ছে দেড়শ বছর। কীভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে, তার বিশদ বিবরণে যাচ্ছি না। ভারতের রাজনৈতিক গগনে ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে যে স্বাধীনতা সূর্য উদিত হল ব্রিটিশ শাসনরূপী বর্বরতা, নির্মমতা ও অমানুষিকতার অতলান্ত তমিস্রা থেকে ছিনিয়ে আনার যে অন্তহীন ও মরণজয়ী সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের এক সুমহান ও গৌরবময় অধ্যায় হল সাঁওতাল অভ্যুত্থান। ঐ অভ্যুত্থানের গণনায়কদের শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করে আমার এ লেখার ইতি টান্‌ছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

ভারতে ব্রিটিশ শাসন ঃ কার্ল মার্কস

আজিকার ভারত ঃ রজনী পামদত্ত

ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ঃ এল. নটরাজন্

১৮৫৫ সনের সাঁওতাল হুল ঃ দিগম্বর চক্রবর্তী

আমার লেখা নিম্নলিখিত গ্রন্থদ্বয় ঃ হুল, সাঁওতাল অভ্যুত্থান ও উপজাতীয়দের সংগ্রাম

বীরসা মুন্ডা ঃ কে. এস. সিংহ

'কিশোরমন' একটু অন্য চোখে

শ্রীমতী ঊর্মি চক্রবর্ত্তী
গবেষণা আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিষদ

দৃশ্য এক ঃ ঝমঝমে বৃষ্টি আর মায়ের থমথমে মুখ কোনোটাই এই মূহুর্তে ভাল লাগছে না শ্রেয়ার। মায়ের হাতে তার উইকলি টেস্টের খাতা। বিষয় অঙ্ক। নম্বর পঁচিশে আট। অর্থাৎ মাত্র একটি বীজগণিত ও একটি পাটিগণিতের অঙ্ক শুদ্ধ হয়েছে। বাকি অঙ্কগুলির বিভিন্ন জায়গায় লালপেনের দাগ। এবার বোধহয় পুরো খাতাখানা দেখা হয়েছে মায়ের। ঝপ্ করে একটা শব্দ হল। জানলার ধার থেকে সরে এল শ্রেয়া। খাতাটা তার পিঠে লেগে মাটিতে পড়ে গেছে। মায়ের চুল খোলা। চোখ রক্তাভ! হাত বাড়িয়ে শ্রেয়ার চুলের মুঠি ধরে টেনে আনলেন। - তোর জন্য আমি কি করি নি বল্? পাঁচশো টাকার টিউটর রাখা, টিভির কেবল লাইন কেটে দেওয়া, নিজে কোথাও না যাওয়া, কাউকে বাড়িতে আসতে না দেওয়া ..... তার এই প্রতিদান? অফিসে মুখ দেখাব কি করে? ফাইনাল পরীক্ষায় কি হবে তা তো বুঝতেই পারছি! বলতে বলতে চুল ধরে মা শ্রেয়াকে টেবিলের দিকে টানতে থাকেন। প্রচন্ড ব্যথা লাগলেও কোনো শব্দ করে না শ্রেয়া। মা ঠেলে দেন তাকে চেয়ায়ের দিকে। ভারসাম্য না রাখতে পেরে পড়ে যায় সে। ব্যথা, রাগ আর অভিমানে কান্না এসে অবশ করে দেয় শ্রেয়াকে। অনেক কিছু বলার জন্য তার চিত্ত উতলা হলেও একটি বাক্যও বলে না সে। আর অপেক্ষা নয়। আজ। আজই সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। এরকম তো প্রথমবার নয়। প্রায় সময়ই হচ্ছে। বাবা বাড়িতে নেই। থাকলেও মায়ের উগ্র বকুনি বা মার দেবার সময়ে নিঃশব্দে চলে যান অন্যত্র। তবে কার জন্য থাকবে শ্রেয়া? এখানে কেউ তাকে বোঝে না বা চায় না। চায় শুধু তার পরীক্ষার নম্বর।

দৃশ্য দুই ঃ পড়তে যাবার জন্য বই গোছাচ্ছে তৃণা। সন্ধানী দৃষ্টিতে তৃণার মা ব্রাউন পেপারে মলাট দেওয়া খাতাটা টেনে নেন। - ইংরেজী পড়তে যাচ্ছিস তো ভু-গোলের খাতা কেন? তৃণা পেন-পেনসিল ব্যাগে নিতে নিতেই জবাব দেয় - পরমাকে দিতে হবে, ও চেয়েছে মা। আজই ফোটোকপি করে খাতা ফেরৎ দিয়ে দেবে। মা কিন্তু খাতাটা হাতেই রাখেন, বলে ওঠেন - পরমাকে তুমি কেন খাতা দেবে? তৃণা - ও আমার বন্ধু মা, নোটটা চেয়েছে .....! মা কিন্তু অনড় থাকেন, বলেন - পড়ার ব্যাপারে কোনো বন্ধু হয় না। ও তোমাকে কি দেয় তৃণা? তাছাড়া এটা তোমার প্রাইভেট স্যারের নোট। ওকে কেন দেবে? দুজনের লেখা এক হলে তুমি বেশি নম্বর পাবে কি করে তা ভেবে দেখেছ?

একটা অদম্য রাগ ঘিরে ধরে তৃণাকে। মাস তিনেক আগেই সহপাঠী দিয়ার সাথে মেলামেশার ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ জারি করেছিলেন তৃণার বাবা। দিয়ার প্রথম অপরাধ, সে ক্লাসে এক থেকে দশের মধ্যে স্থান পায় না। দ্বিতীয় কারণ দিয়ার বাবা তৃণার বাবার অধস্তন কর্মচারী। ভয় করতে থাকে তৃণার। তবে তার কোন বন্ধু হবে না? ছেলেদের সাথে মেশা দূরে থাক্ কথা বলাই বারণ। মেয়েদের মধ্যেও যদি এত বাদবিচার করেন বাবা-মা, তবে সে কি করে? নাঃ। কোনো কথাই এদের বলা যাবে না। যা করতে হবে গোপনে বা লুকিয়ে। জেদ্ বেড়ে গেল তৃণার। খাতাটা সে দেবেই, যেমন করে হোক্।

দৃশ্য তিন ঃ অভীক জোরে পা চালাচ্ছে বাড়ির দিকে। আজ সে স্কুলবাসে ফিরতে পারে নি। দেরি দেখে মা নিশ্চয় দোতলার বারান্দার দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু ক্লাস শেষে খেলাটা এমন জমে গিয়েছিল, উঃ! ছয় মারার খুশির রেশ এখনো রয়ে গেছে। প্রদীপ স্যার নিজে পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন অভীকের। অদৃশ্য ব্যাটসহ হাতটা একবার শূণ্যে ঘুরিয়ে নেয় অভীক। দু-তিন লাফে সিঁড়ি পার হয়ে মায়ের সামনে উপস্থিত হয় সে। মায়ের গালে চোখের জলের দাগ। - তোর এত দেরি হল কেন অভীক? ভয়ে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে! না পেরে তোর বাবাকে ফোন করে দিলাম।

মুখটা শুকিয়ে যায় অভীকের। ক্রিকেটের কথাটা মাকে আর বলা হয় না। আমতা আমতা করতে থাকে। অথচ মিথ্যা বলার অভ্যাস তার নেই। স্কুলের পোশাক ছাড়তে ছাড়তেই সে বাবার

গাড়ির শব্দ পায়। উদ্বিগ্ন মুখে উপরে উঠে আসেন বাবা। হাতের ব্রীফকেস্ নামিয়ে জুতো খুলতে খুলতে বলেন - ফিরেছে তাহলে? সামনে আসে অভীক। চোখ তার মাটির দিকে। বাবা একঝলক সেদিকে তাকান, তারপর বলেন - আজকের গল্পটা কি? পড়া না পারা? দুষ্টুমি? না খেলা? অভীক বাবার মেজাজটা আন্দাজ করতে থাকে। ক্রিকেটের কথাটা বলা সঙ্গত হবে কি! অবশেষে বলেই ওঠে - সরি বাবা! জানো আজ .....। কথা শেষ হয় না অভীকের। বাবার দৃষ্টি স্থির। মায়ের গালে হাত। কেটে কেটে উচ্চারণ করেন বাবা। খেলা? আপত্তি নেই, কিন্তু আমার ছেলে হবে সবার সেরা। ক্রিকেট কোচিং - এর ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু তোমাকে একবছরে জাতীয় স্তরে খেলতে হবে। রাজী? অভীক চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করবে কি? ভাবনায় ডুবে যায় সে।

উপরের গল্পগুলো শ্রেয়া, তৃণা বা অভীকের হলেও ওদের আমরা সবাই চিনি। এমন বহু ছেলেমেয়ে আমাদের বাড়িতে, আত্মীয় পরিজন বা প্রতিবেশীদের পরিবারে আমরা দেখতে পাই। আমরা বড়রা ওদের বুঝতে চেষ্টা করি আমাদের মত করে। আমরা যে ওদের ভাল চাই, এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। তাই আদর বা শাসন যা-ই করি তা ওদের মঙ্গলের জন্যই করি। তবু কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যায়, যার গুরুত্ব আমরা অনেক সময়ই তলিয়ে ভেবে দেখি না বা বুঝি না। কত দুর্ঘটনা ঘটে যায় আমরা তা রোধ করতে পারি না। এমনকি আগাম আভাসও পাই না। কত অবাঞ্ছিত আচরণ চলে আসে এইসব ছেলেমেয়েদের মধ্যে যার অভিঘাত দীর্ঘদিন তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কেন এমন হয়? আসুন আমরা শ্রেয়া, তৃণা আর অভীকের সঙ্গেই দেখি পরবর্তী অংশ।

ঘটনাচক্রে এই ছেলেমেয়েদের বাবা মায়েরা এদের অবাধ্যপনা, গোপন করার প্রবণতা, পড়ায় অমনোযোগ, পরীক্ষাভীতি ইত্যাদি অগোছালো আচরণের সমাধান খুঁজতে জড়ো হন এক মনস্তত্ত্ববিদের কাছে। মনস্তত্ত্ববিদ্ কেবল সময় নিয়ে কথা বলেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, ওদের কি সমস্ত লিখতে দেন, কখনো বা ছবি দেখান আর ছোট ছোট কর্মসূচী বলে দেন বাড়িতে অভ্যাস করার জন্য। বাবা মায়েদের সঙ্গেও তিনি আলোচনা করেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ওদের ছেলেমেয়ের আচরণকে বিশ্লেষণ করেন।

সত্যি বলতে কি শ্রেয়া, তৃণা আর অভীকের বাবা মায়েরা কমবেশি পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন তাঁদের সন্তানদের মধ্যে। সেইসব নিয়ে আজ একটা দলগত আলোচনা চলছে মনস্তত্ত্ববিদের সঙ্গে। ওঁদের অনেক সংশয় আর কৌতুহল আছে ছেলেমেয়েদের নিয়ে। সেগুলিই তাঁরা বুঝে নিতে চান।

আজ তাঁরা মনস্তত্ত্ববিদ্ বা কাউন্সেলরের সাথে খোলমনে কথা বলবেন বলে প্রস্তুত। দিদির শান্ত স্মিত মুখশ্রী তাঁদের আশ্বস্ত করে। শ্রেয়ার মা বলে ওঠেন সবক্ষেত্রেই কি প্রশ্রয় দেব ওকে? ভাল আর মন্দ অভ্যাসটা তো আমরাই শেখাব। এজন্য বকাবকি করতে হবে না! কাউন্সেলর শান্তভাবে উত্তর দেন - আপনি ভাল ব্যবহার শেখাতে চান বলেই বকাবকি করেন। কিন্তু বকাবকি ব্যাপারটাই যে ভাল ব্যবহার নয় সেটা তো বোঝেন। তাৎক্ষণিকভাবে সে আপনার কথা মেনে নিলেও পরে তা পালন করবে এমন নিশ্চয়তা নেই। বরং একটু ধৈর্য ধরে বোঝালে ভাল ফল হয়। আপনার ছেলে বা মেয়ে আপনাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে, নির্ভর করে এবং অনুসরণ করে। তাই আপনার ধৈর্য, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার, দায়িত্ববোধ, ভাল অভ্যাসকেই ও গ্রহণ করবে। যদি বকাবকি কমিয়ে এগুলো বেশি করে পালন করা যায় তবে কোনো ব্যাপারেই ওকে নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। ভাল অভ্যাসের মূলতত্ত্ব ওর মনে গেঁথে যাবে।

এটা অবশ্য সত্যি কথা আমি ওর ব্যাপারে নিজেকে কিছুতেই শান্ত রাখতে পারি না, বলে ওঠেন শ্রেয়ার মা। - বিশেষ করে যখন আমার আত্মীয়-স্বজন বা কলিগের ছেলেমেয়ের পাশে ওর কথা ভাবতে যাই। কাউন্সেলরের মুখের রেখার পরিবর্তন হয় না। বলে ওঠেন ঠিকই তো। আপনার প্রত্যাশা থাকবে আপনার সন্তানকে নিয়ে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভুললে চলবে না সেই ছেলে বা মেয়েটি একটি আলাদা মানুষ। আলাদা ব্যক্তিসত্ত্বা। তার সামর্থ্য, সীমাবদ্ধতা, ইচ্ছে-অনিচ্ছে, আনন্দ-দুঃখ, হতাশা-স্বপ্ন সবই আছে। আপনার অন্যদের সাথে অনবরত তার তুলনা করা বা প্রত্যাশার নগ্ন প্রকাশ ওকে বাড়তি চাপের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে না তো! তিনি আরো যোগ করেন, আমরা বড়দের চোখ দিয়ে ওদের পরিমাপ করি, সেটাই ওদের সাথে আমাদের ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। তাহলে আসুন না আপনার স্বপ্ন ওর সাথে ভাগ করে নিন। দুজনেই আন্তরিকভাবে পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করুন। এছাড়া বারবার অন্যদের সাথে তুলনা ওকে হীনমন্যতার দিকে ঠেলে দেয়। তাই এই ব্যাপারটাও ভেবে দেখতে হবে।

তৃণার মা অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। তিনি বলে ওঠেন - আমাদের অভিজ্ঞতা বেশি তাই কে ভাল বন্ধু কে খারাপ তা তো আমাদেরই দেখিয়ে দেওয়া উচিত। কাউন্সেলর উত্তর দেন - আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা বড়, স্বভাবতই আমাদের অভিজ্ঞতা বেশি। তাই শুধু নিজের নিজের ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে ভাবলেই চলবে না। যৌথ পরিবারে যে ছেলেমেয়েরা বেড়ে ওঠে, তাদের সুযোগ থাকে মেলামেশা করবার এবং বিভিন্ন চরিত্র দেখবার। বর্তমানে একক পরিবারগুলিতে সে সুযোগ মেলে না। এইসব একক পরিবারের নিঃসঙ্গ ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে সুস্থ ও সুষম মানসিকতা গড়ে তোলার ব্যাপারে বন্ধুত্ব গভীর তাৎপর্যমূলক বিষয়। তাই সামাজিক অবস্থান বা কেবলমাত্র প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনকে বড় করে দেখিয়ে বন্ধুত্ব ভাঙতে বা গড়তে নির্দেশ দিলে ওদের বিচার বিবেচনাকেই আঘাত করা হবে। আমরা পাশাপাশি সহযোগিতা, স্বাভাবিক দয়ামায়া বা সহানুভূতির মনোভাবকেও গুরুত্ব দেব। যার ফলে ছেলেমেয়েরা আত্মবিশ্বাসের সাথে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কে ভাল বন্ধু আর কে নয়।

কাউন্সেলর বলেন - এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলে রাখা ভাল। শৈশব থেকে যারা কৈশোরে পা রেখেছে, তাদের স্বাধীন চিন্তাভাবনা বা সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাকে দমন করলে পরিণত বয়সেও তারা প্রত্যাশিত আচরণ করতে পারবে না। সুতরাং কোথাও ভুল করলে তা যেমন দেখিয়ে দিতে হবে, ঠিক করলে প্রশংসাও করতে হবে। নিজেদের সমস্যার সমাধান ওরা নিজেরাই করতে চাইবে। সে বিষয়ে বাধা না দেওয়াই ভাল। তবেই তারা বড়দের বন্ধুভাবাপন্ন মনে করবে এবং ভুলগুলোকে এড়াতে উদ্যোগী হবে।

এগুলো না হয় বুঝলাম, বলে ওঠেন অভীকের বাবা, তাহলে কি ওদের সামনে কোনো লক্ষ্য বা টারগেট্ রাখতে পারব না? অল্প হেসে কাউন্সেলর বলেন - লক্ষ্যমাত্রা রাখতেই পারেন। কিন্তু তা যেন খুব দূরবর্তী না হয় যা ওদের মনে হবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাছাড়া কেবলমাত্র বাবা মায়ের স্বপ্নপূরণের জন্যই ওদের জীবন নয়। আপনার সন্তান এবং আপনি পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে ওর নাগালের মধ্যে একটা লক্ষ্য ধার্য করুন। দেখবেন সেই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে আপনি এবং আপনার সন্তান কতখানি তৃপ্তি পাবেন। অনায়াসে আপনারা তার পরবর্তী লক্ষ্য বা মাইলস্টোন নিজেরাই ছকে নিতে পারবেন। আরো বলি দূরবর্তী লক্ষ্য থাক না আপনাদের স্বপ্নে। কিন্তু একবারে যদি সেদিকেই আঙুল নির্দেশ করেন তা ছেলে বা মেয়েটির মনে উদ্বেগ আর হতাশা এনে দেবে যে।

গলাটা পরিষ্কার করে কাউন্সেলর বলেন আপনাদের সবার কাছে আমার একটা ছোট আর্জি আছে। আপনাদের সন্তানদের সবচেয়ে কাছের মানুষ আপনারাই। তাই আপনারা যদি ওদের মত করে ওদের সমস্যাটাকে দেখতে পারেন তবে সহজেই ওদের বন্ধু আর পথপ্রদর্শক হতে পারবেন। আপনাদের মনের কথা খুলে বলতে ওরা সংকোচবোধ করবে না। এটাই কিন্তু পারস্পরিক আস্থা অর্জনের সহজ পথ। ওদের মন খুলে কথা বলতে সুযোগ দিলে ওরাও বড়দের কথা শুনবার আগ্রহ দেখাবে। বড়দের মতামতকে অবাঞ্ছিত বা আরোপিত কৌশল বলে মনে করবে না। নিজের নিজের সিদ্ধান্তকে আরো বাস্তবসম্মত এবং পরিণত করতে পারবে। আসুন আমরা ওদের বুঝতে দিই যে কেবলমাত্র প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, বন্ধুত্ব, দায়িত্ব, পরমতসহিষ্ণুতা - সবগুলিরই গুরুত্ব আছে আমাদের জীবনে।

সবপেয়েছির আসর

হীরক জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উৎসব ও শিশুমেলা

২৭ শে ডিসেম্বর — ৩১ ডিসেম্বর ২০০৫

ব্যবস্থাপনায় ঃ আদর্শপল্লী ইয়ংস্ এ্যাসোসিয়েশন্

—ঃ স্থান ঃ—

রায় নগর মাঠ ✯ কে. এফ. আর. ময়দান ✯ বেহালা গার্লস স্কুল

—ঃ অনুষ্ঠান সূচী ঃ—

✿ নৃত্যনাট্য ✿ নাটক ✿ সঙ্গীতমেলা ✿ নৃত্যছন্দ ✿ হরবোলা ✿ যাদুপ্রদর্শন ✿ কথাবলা পুতুল
✿ জিমন্যাস্টিকস্ ✿ পিরামিড ✿ মূকাভিনয় ✿ পুতুল নাচ ✿ জ্যাগলিন ✿ রণপা
✿ আদিবাসী নৃত্য ✿ বহুরূপী ✿ ক্যারাটে ✿ সাক্ষরতা সেমিনার
✿ রক্তদান শিবির ✿ শিশুস্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা ✿ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
ও
আতসবাজী প্রদর্শন

—ঃ অংশগ্রহণে ঃ—

পশ্চিমবঙ্গের সবপেয়েছির আসরের বিভিন্ন জেলার ভাই-বোন
কলকাতার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী
এবং
বাংলাদেশ, সিকিম ও নেপালের ভাইবোনেরা

'হীরক জয়ন্তী বর্ষে সবপেয়েছির আসর

শ্রীদাম সাহা

যুগ্ম সম্পাদক

হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি

সবপেয়েছির আসর ৬১ বছরে পদার্পণ করল। এ আনন্দ ও গৌরব এদেশের শিশু কিশোরদের। আর যারা এদের ভালবাসেন তাদেরও সবপেয়েছির আসরের অতীত আলোকজ্জ্বল হয়েছিল সকলের আন্তরিক ভালবাসায়। বর্তমান সুদৃঢ় হয়েছে শিশুদরদীদের অদম্য আগ্রহে, অফুরন্ত সাহায্যে। আগামী দিনও হীরকমালায় সজ্জিত হবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সহযোগিতায়।

১৯৪৫ সালে ২৯শে জুলাই কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ীতে গড়ে উঠেছিল এই সংগঠন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সবপেয়েছির দেশ' কবিতা অবলম্বনে কবি সুর্ণিমল বসুর নামকরণে যুগান্তর পত্রিকার ছোটদের পাততাড়ির পাতার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বপন বুড়ো সবপেয়েছির আসর প্রতিষ্ঠা করেন। যার আসল নাম অখিল নিয়োগী ১৯০২ সালের ২৭ শে অক্টোবর বাংলাদেশের ময়মন সিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার সাঁকরাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দীনবন্ধু নিয়োগী ও মাতা ভবতারিনী দেবী। সকল শিশুর মনের রাজা মানুষগড়ার কবিতার স্বপনবুড়ো শত সহস্র শিশুকিশোর সোনারকাঠিদের ছোঁয়ার মায়া কাটিয়ে ১৯৯৩ সালে ভাষা শহীদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন করেন। ২০০১ সালে শ্রদ্ধেয় স্বপনবুড়োর জন্মশতবর্ষ সাড়ম্বরে পালন করা হয় বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে।

স্বপনবুড়োর স্বপ্নের রূপায়ণ ঘটেছে। আজ সবপেয়েছির আসর শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বাংলাদেশ, নেপাল, সিকিম, হল্যান্ড, জার্মানেও পৌঁছিয়েছে। সাতশ শাখা আসরের লক্ষাধিক সোনারকাঠি ভাইবোনেরা বিদ্যালয় ও সামাজিক জীবনের সাথে সংহতি রেখে দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশ সাধনের কাজ করে আসছে। প্রতিটি শিশুর শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, নৈতিকতায়, দেশাত্ববোধে উচ্চস্তরে উন্নয়ণের জন্য সর্বাত্মক সাধনাই সবপেয়েছির আসরের পূর্ণ কর্মসূচী, আর তাতেই স্থায়ী সিদ্ধিলাভ করা পূর্ণ লক্ষ্য।

'বিদ্যালয় শিক্ষার পরিপূরক' শিক্ষণ কর্মসূচী নিয়ে সবপেয়েছির আসর ক্রমশঃ জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে নানান বৈচিত্রময় কর্মসূচী নিয়ে। প্রতিদিন বিকেলে নিয়মিত খেলাধূলা, কুচকাওয়াজ, ছড়ারব্যায়ম, ভঙ্গীগীতি, ব্রতচারী, যোগব্যায়াম, এ্যারেবিক্‌স, জিমনাষ্টিকস্‌, পিরামিড, খো খো, কাবাডি, লাঠি, নানাবিধ দেশবিদেশী ড্রিল, লোকনৃত্য যেমন পটুতা বিধানের জন্য চর্চা করা হয়, তেমনিই সুস্থ সংস্কৃতির চেতনার জন্য উৎকর্ষ সাধনের কর্মসূচী পালন করা হয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ সমষ্টিগত গঠনমুখী ত্যাগব্রতী চিন্তা ও কর্মধারায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষণ শ্রেণী, শিক্ষা শিবির, কর্মী সম্মেলন, কর্মী শিবির, বার্ষিক শিবির সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয় পত্রিকা, স্মরণিকা, শিক্ষণ পুস্তিকা, নির্দেশক গ্রন্থাদি। বার্ষিক উৎসব, নববর্ষ উৎসব, পতাকা দিবস, শোভাযাত্রা, সত্যসেবী পরীক্ষা, প্রবেশিকা, মধ্যম ও অগ্রণী পর্যায়ে শিক্ষণ ও পরীক্ষা। প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সমস্ত বছরের কর্মধারার উৎকর্ষ সম্ভাবনা এবং সামগ্রিক সাফল্যের চিত্র উদঘাটিত হয়। স্বপন বুড়োর কথায় 'সবপেয়েছির আসর মানুষ গড়ার কারখানা।'

রাজ্য ও জাতীয়স্তরে বহু সোনারকাঠি কৃতিত্ব অর্জন করেছে। সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির শীর্ষে, এমনকি প্রশাসন ও রাজনীতিতে নেতৃত্ব এসেছেন আসরের প্রাক্তনরা। বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, বিদ্যালয়ের শরীর শিক্ষণ সর্বত্র সবপেয়েছির আসর নিজ যোগ্যতায় বর্তমান। সোনারকাঠি, কর্মী ও কেন্দ্রীয় কর্মী চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, ফ্রান্স ও বাংলাদেশে আন্তর্জার্তিক পাইওনিয়ার শিবির ও সার্ক শিশু সম্মেলনে যোগদান করেছে। আসরের উৎসব অনুষ্ঠানে বহুজন এসেছেন। আমন্ত্রণ এসেছে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে উৎসব, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করার জন্য। আসরের শিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষকগণ শাখা আসর ছাড়াও বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে সুনাম কুড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষার সিলেবাসে

Library

সবপেয়েছির আসরের কর্মসূচীকে গ্রহণ করে স্বীকৃতি দিয়েছে। বেহালা জেমস্ লঙ্ সরণীতে আসরের নিজস্ব ভবন কেন্দ্রীয় কলা বিকাশ কেন্দ্রে কচিকাচারা নিয়মিত নাচ, গান, যোগাসন ও আঁকার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এবং শিশুস্বাস্থ্য ও চক্ষু চিকিৎসারও ব্যবস্থা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিকদল বাংলাদেশ, জম্মু, জয়পুর, পাটনা ও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করে প্রশংসা পেয়েছে।

হীরক জয়ন্তী বর্ষে বর্ষব্যাপী কর্মসূচী শাখা আসর, অঞ্চল ও কেন্দ্রীয়স্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে লোকনৃত্যগীতি পুস্তক। আগামী ২৭ শে ডিসেম্বর থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০৫ হীরক জয়ন্তী বর্ষ পূর্ত্তি উৎসব কলকাতা বেহালার আদর্শ পল্লী ইয়ংস এসোসিয়েশন (দিশারী সবপেয়েছির আসর) এর ব্যবস্থাপনায় বেহালা গার্লস স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় শিশু ভবনে স্বপনবুড়োর আবক্ষ মর্মর মূর্তি উন্মোচন হবে এবং প্রকাশিত হবে স্মারক পুস্তক সংগঠনী। পাঁচ দিনের শিশু মেলায় থাকছে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ক্রীড়া অভিপ্রদর্শনী, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, শিশু স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবির, আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীত, নাটক, নৃত্যনাট্য, হরবোলা, জ্যাগলিন, যাদুবিদ্যা, কথাবলা পুতুল, মুকাভিনয় ইত্যাদি। অংশ নেবে সবপেয়েছির আসরের সমস্ত জেলার সোনারকাঠি ভাইবোন, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও বিদেশী ভাইবোনেরা।

এই উৎসবকে সফল করতে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা আশাকরি। হীরক জয়ন্তী বর্ষের সোনালী দিনগুলি স্বর্ণময় ইতিহাস রচনা হোক। ঘরে ঘরে আসরের বাণী পৌঁছে দিয়ে গৌরবময় প্রতিষ্ঠানকে শতবর্ষের দ্বারে পৌঁছে দিই।

পড়তে চাই জানতে চাই এসব আমার অধিকার।
বড় হয়ে উঠব বেড়ে এ হোক সবার অঙ্গীকার।।

শব্দ দূষণ

ডঃ জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ
প্রাক্তন সভাপতি
প. ব. প্রাথমিক শিক্ষাপর্ষদ

"সর্বম্ অত্যন্ত গর্হিতম্"
"সবকিছুরই বাড়াবাড়ি খারাপ"
- প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোক

শব্দ আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম, শব্দ ছাড়া আমরা বলতে পারি না, পরস্পর ভাব বিনিময়ের ভাষা যুগিয়েছে শব্দই। পাখির কলকাকলি, সেতারের সুরেলা ধ্বনি, সুন্দর সঙ্গীত, সুরেলা কণ্ঠের আবৃত্তি - এসব আমাদের শ্রবণ মনকে তৃপ্তি দেয়। একটা নিঃশব্দ ঘরে দিনের পর দিন যদি আমাকে রেখে দেওয়া যায় তবে তো আমি পাগল হয়ে যাব। কাজেই শব্দ এক অমূল্য সম্পদ। কিন্তু এই শব্দ যদি প্রবল হয়ে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায় তবে সেই শব্দ আমাদের বিরক্তি উদ্রেক করে, অস্থির করে দেয়, কান প্রাণকে জব্দ করে সেই শব্দ হয়ে ওঠে শব্দযন্ত্রনা।

একটানা হাতুড়ি মারার শব্দ, মোটর গাড়ির এয়ারহর্ন একটানা জোরে বাজানো, রাস্তা দিয়ে পরপর ভারী ট্রাক চলে যাচ্ছে সেই আওয়াজ, একটানা জলের পাম্প বা জেনারেটার চালানোর শব্দ, জোরালো শব্দের বাজি পটকা ক্রমাগত ফাটানো, মাইক্রোফোনের জোরালো আওয়াজ একনাগাড়ে হয়ে যাওয়া এসব কিছুই শব্দযন্ত্রনার কারণ হয়। অবশ্য অনেকক্ষেত্রে একজনের কাছে যে শব্দ অনভিপ্রেত, অন্য আর একজনের কাছে সেই শব্দই অভিপ্রেত হতে পারে।

শব্দদূষণ হল শব্দের প্রাবল্যের মাত্রা একটানা একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাই। বিশেষ করে অনভিপ্রেত স্থানে অনভিপ্রেত শব্দ শব্দদূষণ ঘটায়।

এখন, শব্দের প্রাবল্যের পরিমাপ করা হয় **বেল বা ডেসিবেল এককে**। দূরভাষের আবিষ্কর্তা আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের নাম অনুসারেই এই একক। সম্পূর্ণ সুস্থ কানে শ্রবণযোগ্য ন্যূনতম প্রাবল্যের শব্দের প্রাবল্যমাত্রা হল ০ ডেসিবেল, গাছের পাতার মৃদু মর্মর ধ্বনির প্রাবল্যমাত্রা হল ১ বেল বা ১০ ডেসিবেল। দুজন লোক ফিসফিস করে পরস্পরের সঙ্গে কথা বললে সেই শব্দ প্রাবল্য ৩০ ডেসিবেলের মত, আর স্বাভাবিক কথোপকথনে শব্দের প্রাবল্যমাত্রা মোটামুটিভাবে ৫০-৬০ ডেসিবেল। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্ধারিত শব্দর নিরাপদ প্রাবল্যমাত্রা দিনের বেলায় বসতি এলাকায় ৪৫ ডেসিবেল এবং শিল্প এলাকায় ৫৫ ডেসিবেলের বেশি নয়। এমনকি ৪৫ ডেসিবেল প্রাবল্যের শব্দ ও যদি একটানা আমাদের কানের কাছে হয়ে যেতে থাকে তবে আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। শব্দের প্রাবল্যমাত্রা ৮০ ডেসিবেল হলেই আমাদের শ্রবণের অসুবিধা ঘটে। ৮৫ ডেসিবেলের বেশি প্রাবল্যের শব্দ আমাদের শারীরিক মানসিক সুস্থতার পরিপন্থী। ৯০ থেকে ১০০ ডেসিবেলের শব্দর মধ্যে দীর্ঘক্ষণ থাকলে কানের স্থায়ী ক্ষতির সম্ভাবনা আর ১৩০ থেকে ১৪০ ডেসিবেলের শব্দপ্রাবল্য আমাদের একেবারে বধির করে দিতে পারে। ১৬০ ডেসিবেলের শব্দ কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে সক্ষম।

আলোচনার প্রেক্ষিতে আধুনিক সভ্যতার বিশেষ করে নগর সভ্যতার অনুষঙ্গ কয়েকটি উৎস-জাত শব্দের প্রাবল্যমাত্রা লক্ষনীয়।

শব্দ - উৎস	শব্দের প্রাবল্যমাত্রা (ডেসিবেলে)
রেডিও জোরে বাজানোর আওয়াজ	৭০
বাজি পট্‌কার আওয়াজ	৯০ - ১২০
উচ্চগ্রামে মাইক্রোফোন বাজানোর আওয়াজ	১০০ - ১১০
ভারী যানবাহন চলার শব্দ	১০০
জলের পাম্পের মোটর / জেনারেটার	৯০ - ১০০
রক মিউজিক / পপ সঙ্গীত	১০০ - ১২০
এরোপ্লেন	১২০

কলকাতার কয়েকটি এলাকায় শব্দপ্রাবল্য মাত্রা কেমন সে সম্পর্কে নীচের সংক্ষিপ্ত সারনীটি থেকে কিছুটা ধারনা মিলবে।

স্থান	এলাকার প্রকৃতি	শব্দপ্রাবল্যমাত্রা (ডেসিবেলে)		
		সকালে	অপরাহ্নে	রাতে
গড়িয়াহাট মার্কেট	বাণিজ্যিক	৭৭.৯	৮১.৬	৭৫.৬
রাসবিহারী মোড়	বণিজ্যিক	৭৬.১	৭৮.৭	৮১.৫
পার্কস্ট্রীট	বাণিজ্যিক	৭৯.২	৮১.১	৭৭.৮
শিয়ালদহ স্টেশন	বাণিজ্যিক	৬৯.৭	৭৬.৫	৭১.০
বি. বা. দী. বাগ	অফিস (বাণিজ্যিক)	৮৫.৬	৭৩.৩	৭৪.৫
শ্যামবাজার	বাণিজ্যিক	৮০.৩	৭৮.১	৭৬.৫
ডানলপ ব্রিজ	শিল্প এলাকা	৮২.৮	৮১.১	৭৩.৩
উল্টোডাঙ্গা	শিল্প এলাকা	৮৪.৬	৭২.৮	৭৭.০

(তথ্য - উৎস ঃ পশ্চিমবঙ্গ দূষণ-নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ)

শব্দদূষণের সম্ভাব্য কিছু ফলাফল

উচ্চ প্রাবল্যের শব্দের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ থাকলে আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে।

শব্দ যেহেতু আমরা কান দিয়ে শুনি, তাই প্রবল শব্দ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কানেরই ক্ষতি করে, অতি প্রবল শব্দ কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে পারে, আমরা চিরতরে বধির হয়ে যেতে পারি। কিন্তু কানের ক্ষতি করা ছাড়াও শব্দদূষণ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যতর মানসিক ও শারীরিক ব্যাধির কারণ হয়ে উঠতে পারে। একটানা প্রবল শব্দ আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে, ক্রোধপ্রবণ করে তুলতে পারে, মানসিক চাপ ও উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দিতে পারে, আমাদের মাথার যন্ত্রনা হতে পারে, আমাদের মনঃসংযোগের অভাব ঘটতে পারে, কর্মক্ষমতা কমে যেতে পারে, বিভিন্ন স্নায়ু রোগে আমরা আক্রান্ত হতে পারি। শব্দদূষণ - পেপটিক আলসার, কোলাইটিস, রক্তচাপ বৃদ্ধি, হৃদরোগ, করোনারি থ্রম্বোসিস এসবের কারণ হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, বিশেষজ্ঞগণের মতে এমন কোনো শারীরবৃত্তীয় বিষয় নেই যেটি শব্দদূষণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কোনো মানুষকে বদ্ধ ঘরে একটানা প্রবল শব্দের মধ্যে রেখে তাকে উন্মাদ পর্যন্ত করে দেওয়া সম্ভব।

হৃদরোগে আক্রান্ত এমন মানুষদের পক্ষে প্রবল শব্দযন্ত্রনা মারাত্মক হতে পারে। কয়েকজন ভারতীয় মনোবিজ্ঞানীর গবেষনায় প্রকাশ যে **শব্দ যন্ত্রনার দরুন মাতৃগর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে এবং মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে এমন শিশু জন্মগ্রহণ করতে পারে,** এমনকি **প্রবল শব্দযন্ত্রনার ফলে অকালে গর্ভ পাত পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।** শ্রুতিবিজ্ঞানীরা গিনিপিগের উপর শব্দযন্ত্রনার প্রভাব সম্পর্কে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছেন যে রেকর্ড করা রক্‌মিউজিক একটানা ৪৪ ঘন্টা ব্যাপী শোনানোর ফলে গিনিপিগের কর্ণকোষগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

গভীর অরণ্যের মধ্যে নিঃশব্দ পরিবেশে বসবাসকারী অনেক আদিবাসী সমাজের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে তাদের শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ম এবং অতিদূরের সূক্ষ্ম শব্দের পার্থক্যও তারা ধরতে পারে। অপরদিকে নগরজীবনে তীব্র শব্দের মধ্যে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে শ্রবণসামর্থ্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কোলাহল মুখরিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তুলনামূলকভাবে অনেক নিরালা পরিবেশের সুদানের অধিবাসীদের মধ্যে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যেক্ষেত্রে একজন মার্কিন নাগরিক ৬৫ বছর বয়সে প্রায়

৪০ শতাংশ শ্রবণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, একজন সুদানীর শ্রবণক্ষমতা তাঁর ৭০ বছর বয়সেও প্রায় এটুটই থাকে।

আবার, একই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে কারখানার অধিকতম শব্দপ্রবণ অঞ্চলে যে সব কর্মী কর্মরত থাকেন, ওই কারখানারই কম শব্দপ্রবণ অঞ্চলে কর্মরত শ্রমিকদের তুলনায় তাঁদের মধ্যে আলসার, ফুসফুসের ব্যাধি ইত্যাদি অনেক বেশি করে দেখা যায়।

অতিরিক্ত শব্দবহুল কারখানার শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উপর প্রবল শব্দের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ থাকার ফল কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে ধারনা পাওয়ার জন্য এক ধরনের বানরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে সমপ্রাবল্যের শব্দের মধ্যে এই বানরদের রেখে দেওয়াতে তাদের শরীরে রক্তচাপ প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শব্দ-উৎস সরিয়ে নেওয়ার দীর্ঘক্ষণ বাদেও ওই রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গর্ভবতী মহিলাদের **দীর্ঘক্ষণ পপমিউজিকের আসরে থাকবার অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে তাঁদের গর্ভস্থ বাচ্চা ওই সময়ে অস্থিরতা প্রকাশ করেছে এবং দর্শক-শ্রোতাদের সমবেত করতালি ধ্বনির সময়ে গর্ভের মধ্যে জোরে হাত পা ছুঁড়ে অস্থিরতা প্রকাশ করেছে।**

জাপানে গবেষনায় দেখা গেছে যে প্রবল আওয়াজের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ থাকা গর্ভবতী মহিলারা কম ওজনের বাচ্চা প্রসব করেছেন। এজন্য জাপানে গর্ভবতী মহিলাদের শব্দপ্রাবল্য কম এমন জায়গায় গর্ভবতীকালে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

কলকাতা বিমানবন্দর সংলগ্ন অঞ্চলে পরিচালিত সমীক্ষায় প্রকাশ ওই অঞ্চলের জনসাধারণের শতকরা প্রায় ১৬ জনই কানে কম শোনেন-এর জন্য বিমানের উচ্চগ্রামের শব্দের মধ্যে দীর্ঘকাল থাকার বিষয়টিকে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তুলনামূলক সমীক্ষায় প্রকাশ কলকোলাহল মুখরিত শহরের লোকেরা হৃদরোগ এবং মানসিক রোগে অধিকতর আক্রান্ত হন - শব্দদূষণ যে এর অন্যতম কারণ হতে পারে সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কী করণীয়

প্রশ্ন হল শব্দ-দূষণ নিয়ন্ত্রণে বা এর প্রতিকারে কী করণীয়?

যে কোনো দূষণ নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হল দূষণের উৎসেই কিছু ব্যবস্থা নেওয়া।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে এই ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে মাইক্রোফোন উচ্চগ্রামে না বাজানো, ক্যাসেটের দোকানে জোর আওয়াজে ক্যাসেট রেকর্ডার চালানো বন্ধ করা, মোটরগাড়ি, ট্রাক ইত্যাদিতে এয়ার হর্ন ব্যবহার একেবারে বন্ধ করা, জেনারেটার সেট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা বা তা সম্ভব না হলে জেনারেটারগুলির সঠিক রক্ষনাবেক্ষণ করা, উৎসবে জোরালো আওয়াজ সৃষ্টিকারী বাজির ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা, কলকারখানায় যন্ত্রপাতির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং উপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্যে শব্দপ্রাবল্য কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। যানবাহনে বা বিভিন্ন যন্ত্রে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সচেষ্ট হতে হবে। যেমন, মোটরগাড়ির শব্দ হ্রাসের জন্য যুক্তরাজ্যে আচ্ছাদিত এয়ার কম্প্রেসার বা বায়ু সংনমক গাড়ির ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয়, এর ফলে দেখা যে ৮৬ ডেসিবেলের শব্দকে প্রায় ৬৯ ডেসিবেল প্রাবল্যমাত্রায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়। আমাদের দেশেও মোটরগাড়িতে এ ধরনের এয়ার কমপ্রেসার ব্যবহার করে মোটরযান জনিত শব্দদূষণ মাত্রা অনেকখানি কমানো সম্ভব। পাতালরেলে, চক্ররেলে, ট্রামে বা বিমানেও উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রয়োগে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হওয়া এখনই প্রয়োজন। ভারতে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর কোনো আইন প্রণীত হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উন্নত দেশগুলিতে প্রাসঙ্গিক আইন বহুকাল পূর্ব থেকেই প্রচলিত আছে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দি নয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকট্ অফ ১৯৭২ এ বিষয়ে প্রচলিত আছে। কানাডা সরকারের আইন অনুযায়ী নাগরিকদের রেডিও, টি.ভি., টেপরেকর্ডার এসবের শব্দ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে প্রতিবেশীদের কোনো অসুবিধা না হয়। আমাদের এখানে সরকার বা পুরসভাগুলি এধরনের আইন অবিলম্বে কেন প্রণয়ন করবেন না?

একটানা নিরবচ্ছিন্ন প্রবল শব্দই সাধারণত শব্দদূষণ ঘটায়, তাই অনেকক্ষেত্রে একটানা শব্দকে ভেঙ্গে দিতে পারলেও শব্দদূষণ কিছুটা কমানো যায়, যেমন, স্কুল কলেজে আগে যেমন ঘন্টা বাজানো হত একটানা বৈদ্যুতিক ঘন্টা বাজানোর বদলে তেমনটা আবার চালু করা যেতে পারে, লোকালয়ের মধ্য দিয়ে যাতায়াতকারী ট্রেনেও একটানা শব্দের হর্নের বদলে ঘন্টাধ্বনির ব্যবস্থা করা যেতে পারে (যেমনটি অনেক উন্নত দেশেই করা হচ্ছে)।

দ্বিতীয় ধরনের ব্যবস্থা যা নেওয়া যেতে পারে তা হল শব্দ উৎস থেকে শ্রোতার কানে যাওয়ার পথেই যদি কিছুটা শব্দ আটকে দেওয়া যায় সেই প্রচেষ্টা চালানো। শব্দপ্রবণ এলাকায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঘনসংবদ্ধভাবে শব্দশোষক নির্বাচিত বৃক্ষ-লতা লাগিয়ে শব্দের প্রাবল্য অনেকখানি কমিয়ে আনা যেতে পারে, তেমনি কলকারখানার আওয়াজ বাইরে যাতে খুব বেশি না যেতে পারে সেজন্য ওইসব কলকারখানাকে বেষ্টন করে ঘনসংবদ্ধভাবে গাছপালা লাগানো যেতে পারে।

কলকাতা মহানগরীতে (বা অন্যান্য জনবহুল শহরেও) যানবাহন অধ্যুষিত এলাকায় বিজ্ঞাপন দেবার জন্যে যে অজস্র হোর্ডিং ব্যবহার করা হয় সেগুলি যদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং শব্দশোষক পদার্থ দিয়ে নির্মিত হয় তা হলে সেগুলিও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখ্য ভূমিকা নিতে পারে। হাসপাতাল, ছোটোদের স্কুল এসবকে ঘিরেও গাছপালার ঘন আবেষ্টনী তৈরী করা প্রয়োজন (ফাঁকা জায়গা লভ্য হলে)।

বাড়িঘরে ধাতুনির্মিত আসবাবপত্র অপেক্ষা কাঠের তৈরি আসবাব ব্যবহারই শ্রেয়, কারণ কাঠের তৈরী আসবাব কিছুটা শব্দশোষণে সমর্থ। ভারী ট্রাক, যানবাহন যাতায়াতকারী বড় রাস্তার একেবারে ধারে বসবাসের জন্য বাড়ি করা বা ফ্লাট কেনা এসব সম্ভব হলে এড়াতে পারলেই ভালো। বাড়ির জানলা শব্দগ্রহণ রাস্তার দিকে থাকলে জানলায় ভারী পর্দা লাগানোর ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়। বাড়িতে জলের পাম্প, জেনারেটার এসব প্রবল আওয়াজ সৃষ্টিকারী জিনিস থাকলে সেগুলি শোবার ঘর থেকে বা ছেলে মেয়েদের পড়বার ঘর থেকে যাতে যথাসম্ভব দূরে থাকে সে ভাবেই পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। রেডিও, টি.ভি., টেপরেকর্ডার কম আওয়াজে চালাতে হবে।

আর এক ধরনের ব্যবস্থা হল শ্রোতার দিক থেকেই নিজস্ব কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন। যেমন, কলে কারখানায় প্রবল আওয়াজের মধ্যে কর্মরত শ্রমিকদের কানের পক্ষে ক্ষতিকারক নয় এমন তেলে ভেজা তুলো কানে দিয়ে কাজ করবার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। কানে প্রকারত শব্দের প্রাবল্য কমিয়ে আনতে কানে ব্যবহার করবার উপযোগী বেশ কিছু জিনিস এখন পাওয়া যায়, যেমন ইয়ারপ্লাগ, ইয়ার মাফ, নয়েজ হেলমেট ইত্যাদি। এসবও ব্যবহার করা যেতে পারে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি আইনকানুনের কঠোর প্রয়োগ যেমন জরুরী, তেমনি জনসাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে সার্বিক সচেতনতা গড়ে তুলতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত স্থায়ী ফললাভ দূর অস্ত। কাজেই এ বিষয়ে যথাযথ আইন প্রণয়ন, সেই আইনের কঠোর প্রয়োগে প্রশাসনের আন্তরিক প্রচেষ্টার সাথে সাথে সচেতন জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে এ সমস্যার মোকাবিলায়।

শব্দই ব্রহ্ম, না কি ব্রহ্মই শব্দ?
বেশি হলে বাড়াবাড়ি কান-প্রাণ জব্দ!

শিশুর ভালোয় অনির্বাণ
অনন্য এই প্রতিষ্ঠান

ছড়ার ডালি

শ্রী ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

হায়রে শিশু, জাতির যীশু

তোমার শিশুর দুধ-ঘি-ছানায়
কাটছে জীবন মস্তীতেই,
আমার শিশুর জীবন কাটে
ফুটপাতে আর বস্তীতেই!

তোমার শিশুর মাথার ওপর
বন্-বন্-বন্ 'ফ্যান' ঘোরে,
আমর শিশু কাঁদলে কি কেউ
এক-বাটি দাও 'ফ্যান' ধ'রে?

তোমার শিশুর সন্ধ্যা কাটে
টি.ভি.-র ছবি দর্শনে,
আমার শিশুর বুক ঝাঁঝরা
টি.বি.-র পোকার ঘর্ষণে।

তোমার শিশুর নরম গদি
এক ঘুমেতেই রাত কাবার,
আমার শিশুর ঘুম ভেঙে যায়
স্বপ্ন দেখে ভাত খাবার!

তোমার শিশু বেড়ায় চ'ড়ে
রঙবেরঙের মারুতি,
আমার শিশু বেড়ায় কেঁদেই
দাও বাবা, দাও মা রুটি।

ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ-সাপার-ডিনার
খাচ্ছো দিনে, খাও রাতে,
যীশুর শিশু ভিখ্ মাগে রোজ
শেয়ালদা আর হাওড়াতে।

একই গ্রহের মানুষ সবাই
একই আকাশ-জল-মাটি,
তবুও কেন তফাৎ এতোই?
নাড়ায় কারা কলকাঠি?

তুতুল-পুতুল

মা-কে ডেকে বললে কেঁদেই
সাত বছরের তুতুল,
এই দ্যাখো মা পিন্টু আমার
দিয়েছে ভেঙেই পুতুল!

— কি বললি, পিন্টু পুতুল
ভাঙলো কেমন ক'রে?
— পুতুল দিয়েই ওর মাথাতে
মেরেছিলাম জোরে!!

আলু-থালু

মা-কে এসে বললে কেঁদেই
আট বছরের ছোট্ট লালু,
এই দ্যাখো, রাম গাঁট্টা মেরেই
ফুলিয়ে মাথায় করলো আলু!

মা বললেন, কোথায় পাজি?
চল্, পেলে চড় মারবো গালে,
বললে লালু, রামকে নিয়ে
ওর মা গেছে হাসপাতালে!!

খোকা-চোখা

কানটা ধ'রে বেজায় জোরে
মা বললেন ঃ খোকা,
কোমরে তুই গামছা বেঁধেই
করিস কি তুই বোকা?

আচমকা কান-মলা খেয়েই
বললে খোকা কেঁদে,
দু'দিন বাদেই পরীক্ষা, তাই
পড়ছি কোমর বেঁধে!!

সমবেত ব্যায়াম

সকল শিক্ষার্থী ফাইলে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে জায়গা করে নেবে। সমবেত ব্যায়ামে সাবধান ও বিশ্রাম লাফিয়ে লাফিয়ে করবে এবং সাবধান অবস্থায় হাত মুঠো না করে পাশে খুলে রাখবে। ব্যায়ামে ১ থেকে ১৬ সংখ্যায় আদেশ দিতে হবে বেশ জোরে ও টেনে এবং কেটে। যেমন ১ নং ব্যায়াম শুরু কর - এক - দুই ইত্যাদি। ব্যায়ামগুলি ভালোভাবে সকলের আয়ত্ত্ব হলে ব্যাণ্ডের তালে তালে করা যেতে পারে।

ব্যায়ামের ভঙ্গী ঃ—

১ নং ব্যায়াম ঃ
১) লাফিয়ে ডানদিকে ঘুরে পা ফাঁক, দু'হাত পাশে তোলা। হাতের চেটো নিচের দিকে।
২) লাফিয়ে দু'হাত পাশে নামিয়ে প্রস্তুত।
৩) লাফিয়ে পা ফাঁক ও উপরে তালি।
৪) লাফিয়ে প্রস্তুত। হাত পাশে শব্দ করে নামানো। এইভাবে ১৬ সংখ্যায় ডানদিক দিয়ে ঘুরে নিজ জায়গায় এসে শেষ করতে হবে।

২ নং ব্যায়াম ঃ
১) প্রস্তুত অবস্থায় লাফিয়ে বাঁ হাতের উপর ডান হাত ক্রশ করে পাশে ছড়ানো। হাতের চেটো নিচের দিকে।
২) পায়ের গোড়ালির উপর বসা ও উপরে তালি।
৩) প্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে দু'হাত পাশে ছড়ানো।
৪) প্রস্তুত অবস্থায় হাত পাশে নামানো। ৫-১৬ পর্যন্ত একইভাবে হবে।

৩ নং ব্যায়াম ঃ
১) লাফিয়ে পা ফাঁক ও দু'হাত সামনে কাঁধের সোজা তোলা (হাতের চেটোর মুখোমুখি)।
২) কোমর ভেঙে দু'হাত দিয়ে দু'পায়ের গোছ ধরা। দৃষ্টি সামনের দিকে। হাঁটু ভাঙবে না।
৩) সোজা হয়ে দু'হাত কাঁধ বরাবর শরীরের দু'পাশে। চেটো মাটির দিকে।
৪) লাফিয়ে প্রস্তুত। হাত শব্দ করে নামানো। এইভাবে সম্পূর্ণ ব্যায়ামটি ১৬ সংখ্যায় হবে।

৪ নং ব্যায়াম ঃ
১) লাফিয়ে পা ফাঁক ও দু হাত ভাঁজ করে মাথার উপরে স্পর্শ করে রাখা। চেটো মাটির দিকে। কনুই পাশে টান করে রাখা।
২) কোমর বেঁকিয়ে বাঁদিকে শরীরের অর্ধাংশ ঘোরানো। পা নড়বে না।
৩) ১এর অবস্থানে ফিরে আসা।
৪) লাফিয়ে প্রস্তুত অবস্থা। দু'হাত পাশে দিয়ে শব্দ করে নামানো।

৫ নং ব্যায়াম ঃ
১) বাঁ-পা সামনে (পায়ের পাতা)। দু-হাত সামনে। হাতের চেটো মুখোমুখি।
২) বাঁ পা ভাঙা। দু'হাত বুকে। হাতের চোটো নিচের দিকে। ডান পায়ের হাঁটু ভাঙবে না।
৩) ঐ অবস্থায় দু'হাত পাশে ছড়ানো। হাতের চেটো মুখোমুখি।
৪) প্রস্তুত অবস্থায় আসা।
৫-৮ পর্যন্ত একইভাবে ডান পা দিয়ে হবে এবং ৯-১৬ পর্যন্ত পুনরায় অনুরূপভাবে করতে হবে।

৬ নং ব্যায়াম ঃ
১) বাঁ পা বাঁ পাশে ফেলা। দু'হাত কাঁধ বরাবর পাশে তোলা। হাতের চেটো মাটির দিকে।
২) বাঁ পায়ের হাঁটু ভাঙা (গোড়ালি উঠবে না)। দু'হাত কানের পাশ দিয়ে ওপরে তোলা। হাতের চেটো মুখোমুখি।
৩) ১-এর অবস্থানে ফিরে আসা।
৪) প্রস্তুত অবস্থা। হাত নামানোর সময় শব্দ হবে।
৫ থেকে ৮ নম্বর অনুরূপভাবে ডান পা ডান পাশে বের করে হবে। সম্পূর্ণ ব্যায়ামটি এইভাবে ১৬ মাত্রায় হবে।

৭ নং ব্যায়াম ঃ
১) লাফিয়ে পা ফাঁক, হাত ক্রশকরে কাঁধ বরাবর দু'পাশে তোলা, চেটো নীচের দিকে।
২) ডান হাত নিচে দিয়ে দুলিয়ে বাঁ দিকে দু'হাত কোনাকুণি উপরে তোলা, ডান পায়ের গোড়ালি তুলে বাঁদিকে ঘোরা। দৃষ্টি হাতের দিকে।
৩) হাত দুলিয়ে দু'পাশে নিয়ে আসা। (১এর মত) দৃষ্টি সামনে।
৪) লাফিয়ে প্রস্তুত। হাত নামানোর সময় শব্দ হবে।
৫ থেকে ৮ নম্বর অনুরূপভাবে বিপরীত দিকে। ব্যায়ামটি ১৬ সংখ্যায় সম্পূর্ণ হবে।

৮ নং ব্যায়াম ঃ
(তালি ব্যায়াম) — ১-২-১/২/৩ তালে তিন বার তালি দিয়ে লাফিয়ে ডানদিকে ঘুরে ঐরূপ তিনবার তালি। অনরূপভাবে আবার ডানদিকে ঘুরে তালি এবং আবার ডানদিকে ঘুরে তালি এবং শেষে ডানদিকে ঘুরে নিজ জায়গায় ঐরূপ তিনবার তালি দিয়ে ব্যায়াম শেষ করতে হবে।

এক নজরে বাংলা শিশু চলচ্চিত্র

অধ্যাপক পার্থ রাহা

সম্পাদক, ইন্ডিয়ান স্কুল অব্ সোস্যাল সাইন্সেস্, কলকাতা

আমরা জানিনা কবে কোন আদি কবি লিপিসূর্য কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন, কিম্বা কোন জন্মদিনে পৃথিবীর প্রথম গুহা চিত্র আঁকা হয়েছিল, জানিনা কবে কোন আনন্দে বা বিষাদে আদি গায়ক প্রথম কণ্ঠে সঙ্গীতের মুর্চ্ছনা তুলেছিলেন। না, জানিনা সেই মাহেন্দ্রক্ষণগুলির কথা, কোন ঐতিহাসিক বা গবেষক আজীবন চেষ্টা করেও জানতে পারবেন না এই শিল্পমাধ্যমগুলির জন্মদিন। কোনদিন অনুষ্ঠিত হবে না কবিতার পাঁচ হাজারতম হৈ হৈ ময় জন্মমহোৎসব।

কিন্তু সিনেমার জন্মকথা আমরা জানি। উনিশশো পঁচানব্বই সালের আঠাশে ডিসেম্বর দুনিয়া জোড়া উৎসব হল চলচ্চিত্রের একশোতম জন্মদিনের। চলমান ছবির জন্মদিন আঠারশো পঁচানব্বইয়ের আঠাশে ডিসেম্বর। জন্মলগ্ন ছিল অভিশপ্ত। জন্ম হল পুঁজিবাদের রমরমা অবস্থায়। বিকিকিনির হাটেই জন্ম হল এই মাধ্যমের। ফলে আদিযুগের পূর্বপুরুষদের আকাশের সমান বিস্তৃত হৃদয়ের ছোঁয়া পেল না শিল্পের পরিবারের এই কনিষ্ঠতম সদস্যটি। শিল্প হয়ে ওঠার আগেই তার সঙ্গে পরিচয় হল আর এক শিল্পের যার আর এক নাম বাণিজ্য। ইংরেজী প্রতিশব্দ Industry।

চলচ্চিত্র শিল্পের জন্ম হল পুঁজিবাদের একেবারে তুঙ্গী অবস্থায়। বাণিজ্যের উপকরণ হিসেবেই তাকে ব্যবহার করলেন তার পিতা ল্যুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়। তাঁদের কাছে Moving Shot's বা চলমান দৃশ্যের ছবি নেহাৎই একটা নতুন মজা। সার্কাস বা ম্যাজিক দেখানোর মতই বাণিজ্য করার আরেকটি নতুন উপকরণ। পর্দায় চলমান বস্তু বা মানুষকে দেখতে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হত। অর্থাৎ বাণিজ্য। আর এর চূড়ান্ত রূপ পেল চলমান ছবি যখন সাগর পাড়ি দিল। পা দিল সেদিনের তীর্থক্ষেত্র মার্কিন মুলুকে, ছবি হল মার্কিনী পুঁজির নতুন বাজার। গজিয়ে উঠল ছবি তৈরির কোম্পানি। টমাস আন্যাস এডিসনের ওয়েস্টরেঞ্জ, জন স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকমানের ডিটাগ্রাফ, চ্যাপলিনের কমেডি খ্যাত এখানে।

অর্থাৎ সিনেমা একটা নতুন ব্যবসার হাতিয়ার হল। শিল্পের নয়। গণমাধ্যমের নয়। আর সেই কারণেই ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে 'মুভিংশটস্' বা চলমান ছবি যখন সেদিনের ভারতের রাজধানী শহর কলকাতায় পা দেয় তখন সাধারণ বাঙালি বাবুদের কাছে সিনেমা নতুন আর এক আশ্চর্য মজা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর ব্যবসা করার উপকরণ। আর এই ব্যবসা করার অনিশ্চিত অভিযানে নেমে পড়েন এক বাঙালি যুবক। নাম হীরালাল সেন। তিনি ছবি তোলার আর ছবি দেখানোর কলা কৌশল শিখে নেন এবং কিছুদিন পরেই অনুভব করেন শুধু মুভিং শটস দেখিয়ে দর্শকদের আর আকর্ষণ করা যাবে না। কাহিনীহীন চলমান ছবি তাৎক্ষণিক মজা দিয়েছিল মানুষের ভিতর। কিন্তু ঐন্দ্রজালিক মোহ কেটে গেলে মজাও শূণ্যে বিলীন হয়ে যাবে। মঞ্চের নাটককে হীরালাল ক্যামেরায় তুলে নিলেন। নাটকটি হল সেদিনের মঞ্চসফল নাটক 'আলিবাবা'। নাটকটি সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রায়িত করা হয় ১৯০৩ সালে। যদিও সিনেমার সব ব্যকরণ সেখানে অনুপস্থিত, তবু এই থিয়েটার স্কোপই ভারতের প্রথম কাহিনি চিত্র। রীতিমতো সিনেমা তৈরি হয় ১৯৩৯ সালে। নাম বিল্বমঙ্গল। তৈরি করেছিলেন ম্যাডান কোম্পানি। পরিচালকের নাম রুস্তমজী দোতিঅলা। জাতিতে পার্সি। ১৯৩১ সালের ১১ই এপ্রিল বাংলায় প্রথম সবাক ছবি তৈরি হল বা পুরোপুরি সিনেমা 'জামাই ষষ্ঠী' দর্শকের মুখ দেখল। সবাক ছবির জগতে প্রবেশের কৃতিত্বও ম্যাডানের।

বাংলায় নির্বাক ছবি হয়েছে ১২৩ টি। আর ১৯৩১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলা ছবির সংখ্যা ২০১৯। অর্থাৎ গত শতাব্দীতে মোট বাংলা ছবির সংখ্যা ২১৪২। আমাদের নির্বাক ছবির প্রায় কোনটিই দেখার সুযোগ হয়নি। কিন্তু নামের তালিকা থেকে জানতে পারি এই সময়ে কোন ছোটদের জন্য ছবি হয়নি। আর সবাক যুগের দুহাজারেরও বেশি ছবির মধ্যে শিশু কিশোরদের জন্য ছবি হয়েছে কটি জানেন? মাত্র ৩৭টি। এই সাঁইত্রিশটি ছবির মধ্যে 'ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত অন্নদাদিদি' বা 'রামের সুমতি'র মত সার্বজনীন ছবিও আছে। সত্তর বছরের ইতিহাসে বাংলা ছবির যাদুঘরে অনেক মণিরত্ন জমা হয়েছে। বাংলার দিকপালরা ভারতের চলচ্চিত্রকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ছোটদের দিকে তাকাবার তাঁদের তেমন সময় হয়নি।

বিশের দশকে বাঙালির ছবি করা শুরু হলেও ত্রিশের দশকেই নিউ থিয়েটার্স-এর মুখোমুখি হাতির শুঁড় লক্ষ্মীর বরলাভ করেছে। নায়ক-নায়িকা সরকার মশাইরা গাড়ি জুড়ি চেপেছেন। অনেকেই ভারত জয় করেছেন। কিন্তু চল্লিশের দশক পর্যন্ত তাঁরা ছোটদের

জন্য কোন ছবি করে উঠতে পারেননি। হেমেন্দ্র কুমার রায়ের বিখ্যাত কিশোর উপন্যাস 'যখের ধন' সিনেমা হাউসে আসে '৩৯-এর পয়লা এপ্রিল। কিন্তু না, কিশোরদের জন্য নয়। পরিণত বয়স্কদের দিকে তাকিয়েই ছবিটি তৈরি হয়।

১৯৪৭-এর পনেরোই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হল। রেখে গেল ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা আর দেশভাঙার অভিশাপ। দিল্লির লালকেল্লায় যখন উড্ডীন জাতীয় পতাকা আর আতসবাজীর মহোৎসব, তখন শিয়ালদহ স্টেশনে হাজার লাখো মানুষের চিরদিনের মত দেশ ছাড়ার আর সব হারানো কান্নার আর্তনাদ। জীবনের আর সমাজের সব ক্ষেত্রের মতই চলচ্চিত্রের আঙিনাতেও সেদিন বাংলার ঘোর দুর্দিন। বোম্বাই বহুদিন আগেই কলকাতার তৈরি হিন্দির সর্বভারতীয় বাজার ছিনিয়ে নিয়েছিল। এবার বাংলার নিজস্ব বাজারও গেল। এতদিন কলকাতায় শুধুমাত্র কলকাতাতেই বাংলা সিনেমা তৈরি হত। হত শিল্পি সমাবেশ। আর বাজার ছিল মেদিনীপুর থেকে রংপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম থেকে দিনাজপুর, সিলেট, জলপাইগুড়ি। হঠাৎ, হঠাৎ-ই একদিন দেশনেতাদের স্বার্থ মেটানোর খেয়ালে সে বাজারের দুই তৃতীয়াংশ হারালো বাংলা সিনেমা। '৪৭ থেকে '৫০ সাল পর্যন্ত টালিগঞ্জ থেমে থাকেনি। কিন্তু বাজারের চেহারা ছিল ক্রমাগত নিম্নমুখী। পরিচালকরা দেশভাগের যন্ত্রণা, বা বিষয় নিয়ে কমেডি, ম্যাটিলি আর্ডেনদের রোমান্টিক প্রেম - কোন বিষয়ই অনালোকিত রাখেন নি। লক্ষ্য - বাজারের নিম্নগামীতা রোধ করা। সুতরাং এতদিনের না ছোঁয়া বিষয় কিশোরদের নিয়ে ছবি করার কাজও শুরু হল। এই বয়সের দর্শকরা এতদিন গোপনে ছবিঘরে ঢুকত। এখন তাদের প্রকাশ্য প্রবেশাধিকার হল। বাংলার প্রথম কিশোর উপযোগী ছবি 'পরিবর্তন'। মুক্তি পেয়েছিল '৪৯-এর ২৫ শে অক্টোবর। অর্থাৎ পুজোর উৎসবের ভীড়ে। ছবির পরিচালক সেদিনের প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সত্যেন বসু। সঙ্গীত পরিচালনায় এক অনামী তরুণ সলিল চৌধুরী। একটি স্কুলের হস্টেল জীবন ছিল বিষয়। ভাল ছেলে আর খারাপ ছেলে নিয়ে — এবং করুণ দুর্ঘটনার পর খারাপ ছেলের আচরণ পরিবর্তন নিয়ে প্রথাসিদ্ধ কাহিনি। আছে নীতিশিক্ষা। ভুরি ভুরি উপদেশ। বাংলার এই প্রথম কিশোর ছবি কিন্তু প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ফলে কিছু প্রযোজকরা উৎসাহিত হলেন শিশু-কিশোরদের চলচ্চিত্রের প্রতি। শিশুদের জন্য প্রথম ছবি 'খেলাঘর'। '৫১ সালে তৈরি। শতাব্দী প্রাচীন 'অরোরা ফিলম্ কোম্পানি ছবিটি তৈরি করল। পরিচালনায় ছিলেন সৌমেন মুখোপাধ্যায়। অবশ্য 'খেলাঘর' ছিল পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ছবি। কেননা, তখনো শিশু চলচ্চিত্রের বাণিজ্য সম্ভাবনা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল প্রযোজকদের। '৫১ সালেই পুজোর সময়ে মুক্তি পেল 'বাবলা'। বাংলা ছবিতে দারিদ্র্য চিরকালই দর্শক টানার সবচেয়ে সহজ উপায়। পাশাপাশি বাবলার ভূমিকায় শিশু অভিনেতা নীরেন ভট্টাচার্যর অনবদ্য অভিনয় প্রধান আকর্ষণ হয়ে এল। বাবলা বিপুল জনপ্রিয় হল। একেবারে সুপার হিট্। কার্লোভি ভেরীতে পুরস্কৃতও হল। ফলে পঞ্চাশের প্রথম ভাগে বেশ কিছু শিশু চলচ্চিত্র তৈরি হল। যেমন 'আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ'। 'মিচকে পটাশ' ছবিগুলির নির্মাণ এতই নিম্নমানের ছিল যে কোন ছবিই এক সপ্তাহের বেশি সিনেমা হলে জায়গা পেল না। যথারীতি বাণিজ্য হতাশায় আবার শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণে ভাঁটা পড়ল।

১৯৫৪-৫৫ সালের কেন্দ্রীয় তথ্য আর সম্প্রচার মন্ত্রকের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালে প্রায় স্বশাসিত 'চিল্ড্রেন ফিল্ম্ সোসাইটির পত্তন হল। শোনা গেল, শিশু চলচ্চিত্রের জন্য এই সংস্থা নাকি অনুদান দেবে। 'শোনা গেল'- কিন্তু বাস্তবে তার কোন প্রতিফলনও দেখা গেল না। এমনই সময়ে ১৯৫৯ সাল-এর পয়লা মে বীণা আর বসুশ্রীতে একটি ছবি মুক্তি পেল। 'দেড়শো খোকার কাণ্ড'। শিশু চরিত্রদের নিয়ে এক প্রাণ মাতানো ছবি। ছবিটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। গল্পটি ছিল সেদিনের ছোটদের রাজ্যের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হেমেন্দ্রকুমার রায়ের। এই প্রথম ছোটদের ছবিতে অভিনেতারা ছিলেন ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, পদ্মাদেবীদের মত নামী তারকারা। সঙ্গীত পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং ছবিটি ছিল বারো রীলের। এমন দৈর্ঘ্যের ছোটদের ছবি এর আগে হয়নি।

এই বছরই মুক্তি পেল কিশোর চলচ্চিত্রের দিগ্‌দর্শন ছবিটি। শিশু চলচ্চিত্রের ধ্যান ধারণাই বদলে দিল ছবিটি। বাংলার দর্শকরা শিশু চলচ্চিত্রের এক নতুন জগতে পা ছিলেন। ছবির নাম 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। পরিচালক চিরব্যতিক্রমী প্রতিভা ঋত্বিক কুমার ঘটক। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' শিবরাম চক্রবর্তীর কিশোর উপন্যাস। কে না জানে, হাসির রাজত্বের রাজা শিবরাম - না রাজা নয় - সম্রাট। এক দুরন্ত দুষ্টু ছেলে এ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশায় আর বাবার বকুনির ভয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছে শহর কলকাতায়। এখানে এসে তার নানান মজাদার অভিজ্ঞতা। কিন্তু ঋত্বিকের হাতে এই মজার কাহিনি একেবারে অন্য রূপ পেল। ছোট্ট কাঞ্চনের অভিজ্ঞতার শহর হল নির্মম নিষ্ঠুর হৃদয়হীন শহর। দেখা হল সন্তানহারা মাকে ছেলেধরা বলে নির্যাতন। বিয়েবাড়ির বাহুল্যের মাঝে ডাস্টবিনে ফেলা উচ্ছিষ্ট নিয়ে কুকুর আর মানুষের লড়াই। সব কিছু ছাপিয়ে দেশভাঙার যন্ত্রণা নিয়ে হরিদাস চানাচুরঅলা। দুঃখের মোড়কে মোড়া এই শহর ঘিরে কাঞ্চনের প্রশ্ন 'এই শহরে এত দুঃখ কেন?' আজকের উত্তর আধুনিকদের ভাষায় বলতে হয় — ঋত্বিক শিবরামকে বিনির্মাণ করলেন। সদর্পে ঘোষণা করলেন সিনেমা সাহিত্যের 'নোটবুক নয়', 'কমিক স্ট্রিপ' নয়। সে স্বাধীন

স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম, ঋত্বিকই প্রথম দেখালেন। শিশু চলচ্চিত্র মানে অকিঞ্চিৎকর গল্প কথা নয়, নীতিকথার জ্ঞান শোনানোও নয়। ছোটদের তিনি 'ছেলেমানুষ' ভাবেন নি। জগৎ যা তাই তাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই নিষ্ঠুর জগৎকে একটি নিষ্পাপ শিশুর চোখে দেখা। প্রায় রসার থার্ড সিনেমা বা সিনেমা ভেরিতের কাঠামোয়। শিশু চলচ্চিত্রের প্রকৃত সংজ্ঞার অনুসন্ধান করছিলেন ঋত্বিক।

ছয়ের দশকের প্রথমদিকের উল্লেখযোগ্য ছবি 'ডাকাতের হাতে' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬২ সালে। মূল কাহিনি বরেণ্য সাহিত্যিক অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের। চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের আর এক প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্ব কমল কুমার মজুমদার। পরিচালক শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী খ্যাতিমান তথ্যচিত্রকার। ছবিটি সুনির্মিত। আর রহস্য ছবির সাথে মিশেছিল মানবিক স্পর্শ। ডাকাতরাও ছিল গ্রামের সাধারণ মানুষ। ছবির কোথাও নিষ্ঠুরতা বা হিংসার ছোঁয়া ছিল না। উল্লেখ করার মত ঘটনা হল ছবিটির প্রযোজনা করেছিল চিলড্রেন ফিলম্ সোসাইটি। অর্থাৎ একটি ছবির প্রযোজনা করতে সোসাইটির সময় লেগেছিল সাত বছর।

বহুদিন পরে ১৯৮৮ সালে আর এক তথ্যচিত্রকার নৃপেন গাঙ্গুলি বাংলা কিশোর সাহিত্যের হীরকরত্ন ভোম্বল সর্দারকে চলচ্চিত্রায়িত করেন। ভোম্বল সর্দার বাঙালি ছেলেমেয়েদের বড় আপন, বড় আদরের। কিন্তু সৎ প্রচেষ্টা হলেও ছবিটি খগেন্দ্রনাথ মিত্রের এই অমর কাহিনির সাহিত্য রস দৃশ্যায়িত করতে পারেনি। ভোম্বল সর্দার ছিল রাজ্য সরকারি প্রযোজনা। অতএব বাণিজ্যর মন্দা পরিচালকের ক্ষতি হয়নি।

আবার ছয়ের দশকে চলে যাই। ঋত্বিক আর কিশোরদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেননি। মৃণাল সেন একটি মাত্র কিশোর চলচ্চিত্র করেছেন, রবীন্দ্রনাথের চিরমজার কাহিনি 'ইচ্ছাপূরণ'। কিন্তু শিশুর জগৎ যে মৃণালের করায়ত্ত নয়, সেকথা ছবিতে প্রমাণিত। অবশ্য বাণিজ্যিকভাবে ইচ্ছাপূরণ কোনদিনই সিনেমা হাউসের ভিতরে টিকিট কাটা দর্শকদের মুখোমুখি হয়নি।

এবার আসা যাক ভারতীয় সিনেমার উজ্জ্বলতম, সূর্যসম জ্যোতিষ্কের কথায়। সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' শুধু বাংলা চলচ্চিত্রের নয়, পৃথিবীর মানচিত্রে এক অমূল্য সম্পদ। শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী ফ্যান্টাসির জগতে গেছেন — রূপকথার সঙ্গে বাস্তবকে মিশিয়েছেন। পিতামহের কল্পকাহিনিকে একেবারে শিশু উপযোগী করেছেন যা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের শিশুকে আকর্ষিত করবে। এবং করেছেও। কিন্তু এহ বাহ্য! শিশু চলচ্চিত্রের মোড়কে তিনি এক যুদ্ধবিরোধী ছবি উপহার দিলেন আমাদের। একই সঙ্গে ছোটদের আদরের আর বড়দের ভাবনার ছবি খুব বেশি হয়নি। একমাত্র চ্যাপলিনের ছবিগুলিই এর সঙ্গে তুলনীয়। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৬৯ সালে এক টালমাটাল সময়ের সন্ধিক্ষণে। আবার গুপী বাঘা ফিরে আসে ১৯৮০ সালে। হীরক রাজার দেশে-তে জরুরি অবস্থার কালো দিনগুলির ছায়া পড়েছে ছবিতে। এখানেও ছড়ার ছন্দ আর মোহময়ী সঙ্গীতের শিশুর জগৎ আর তার পিছনে বড়দের ভাবনার ছবি। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। আবার এক দশক পরে গুপী বাঘারা ফিরে এল, ১৯৯২ সালে। কিন্তু ততদিনে তারা অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলেছে। তাদের অপাপবিদ্ধতা। ছবির অন্তর্লীণ ভাবনার পরিসর।

ছোটদের জগতে সত্যজিৎ তাঁর নিজের কাহিনি নিয়ে তাঁর বিখ্যাত চরিত্র গোয়েন্দা ফেলুদাকে নিয়ে ছবি করলেন 'সোনার কেল্লা' ১৯৭৪-এ, সরকারি প্রযোজনায়। আবার ১৯৭৯-তে জয়বাবা ফেলুনাথ। সত্যজিতের হাতে যে কোন ছবিই নিখুঁত হবে। সুন্দর হবে। কিন্তু গুপীবাঘার মত কোন বার্তা নিয়ে আসেনি। কোন ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

আরেক প্রতিষ্ঠিত পরিচালক ছোটদের ছবি নিয়ে ভেবেছেন। ছবি করেছেন বাংলায়, হিন্দিতে। তিনি তপন সিংহ। 'চিল্ড্রেন ফিলম্ সোসাইটির প্রযোজনায় তৈরি 'সবুজ দ্বীপের রাজা', ১৯৭৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা চরিত্র 'কাকাবাবু'-কে কেন্দ্র করে আন্দামানের পটভূমিকায় তৈরি করেছেন তপনবাবু। এখানে এ্যাডভেঞ্চার আছে, সবুজিমা আছে। আছে স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা। এখানে পুরনো 'জ্ঞান বিতরণ' রীতি তিনি গ্রহণ করেছেন। অবশ্য-উপস্থাপনার মুন্সীয়ানার জন্য ছবিটি জনপ্রিয় হয়েছিল। 'কাকাবাবু' আবার এসেছেন সিনেমার পর্দায় ১৯৯৫ সালে পিনাকী চৌধুরীর পরিচালনায়। 'কাকাবাবু হেরে গেলেন' ছবিটি এন.এফ.ডি.সি. আর দূরদর্শনের যুগ্ম প্রযোজনায় তৈরি হয়েছিল। এর আয়ুস্কাল ছিল এক সপ্তাহ, নান্দনিক আনুকূল্যে।

ষাট আর সত্তরের দশকে অবশ্য আরো অনেকে ছোটদের জন্য ছবি করেছেন। 'লালুভুলু', অগ্রদূতের পরিচালনায় এক অন্ধ আর এক পা হারা দুই বন্ধুর জীবনযুদ্ধের কাহিনি। আবেগের সমুদ্রে ভেসে গেলেও মেলোড্রামার চরম উপস্থিতি সত্ত্বেও ছবিটি জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তীকালে হিন্দিতেও ছবিটি পুনর্নির্মিত হয়।

বাংলার নাট্য জগতের প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রও এসেছিলেন কিশোর উপযোগী চলচ্চিত্রের আঙিনায়। ১৯৬১ সালে মুক্তি পায় 'মানিক'। অলিভার টুইস্টের অনুবাদ। অবশ্য পরিচালকের নাম ছিল জনৈক বিজলী বরণ সেন। কিন্তু ছবির মুখ্য-চরিত্র থেকে পরিকল্পনা সব ক্ষেত্রেই ছিল শম্ভু মিত্রের

উপস্থিতি। কুশীলবরাও ছিলেন সেদিনের বহুরূপীর সদস্যরা। দ্বিধা নেই বলতে, নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভুমিত্র চলচ্চিত্রকেও ছবিতে করা নাটক ভেবেছিলেন। চলচ্চিত্রের স্বাতন্ত্র্যকে অনুভব করতে ব্যর্থ হলেন শম্ভু মিত্র। ফলে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায়, অমর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাসের মত অভিনেতাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও ছবির পরিণতি বড়ই করুণ। ক্ষতির বিপুল বোঝা ঘাড়ে চেপেছিল প্রযোজকের। ছবিটি নাটকও হয়নি। ছবিতো নয়ই।

সত্তরের দশকের উল্লেখ করার মত ছবি 'পদিপিসীর বর্মী বাক্স'। লীলা মজুমদারের প্রায় মুখস্থ হয়ে যাওয়া উপন্যাসকে নিয়ে ছবি করলেন 'ছুটি' খ্যাত অরুন্ধতী দেবী। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭২-এ। ছবিটি ছিল রঙীন। ছায়াদেবী পদীপিসীর ভূমিকায় নজরকাড়া অভিনয় করেছিলেন। অরুন্ধতী দেবী অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উপন্যাসটি ছবিতে অনুবাদ করেছিলেন। ছবিটি শিশুরা দল বেঁধে দেখেছিল।

সন্দীপ রায়, সত্যজিৎ ঘরানার ঘেরাটোপে থেকেই দুটি ছবি করেন ছোটদের জন্য। 'গুপী বাঘা ফিরে এল'-র কথা আগেই জানিয়েছি। 'ফটিক চাঁদ'ও সত্যজিতের কাহিনি। ছবিটি তেমন দাগ কাটতে পারেনি। যেমনটি পেয়েছিল ছোট গল্পটি। কোথায় যেন মানবিক আবেদনটি হারিয়ে গিয়েছিল ছবির ভিতর থেকে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চারমূর্তি'-র আসন প্রায় পাকা সব কিশোররেই মনের ভিতর। 'ডিলা গ্রান্তি মেফিস্টোফিলিস্'-এর আহ্বানে সাড়া দেয়নি এমন ছেলেমেয়ে খুঁজে পাওয়া ভার। আজকের হ্যারিপটারের যুগেও। উমানাথ ভট্টাচার্যের সিনেমার সঙ্গে যোগাযোগও বহুদিনের। কিন্তু চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হলেন এই ক্লাসিক কাহিনির চিত্রায়ণে। দুর্বলতম জায়গা হল টেনিদার ভূমিকায় প্রথাসিদ্ধ কমিক অভিনেতা চিন্ময় রায়ের ভাঁড়ামি। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৭৮ সালে। বরং বহুদিন পরে ১৯৯৭ সালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে 'দামু' ছবিটি করেন রাজা সেন। ছবিটি কিন্তু সিনেমার ভাষাতেই কথা বলেছিল। রঘুবীর যাদবের অভিনয় এখানে সম্পদ। ছবিটি বাণিজ্যও করেছিল বেশ ভালোরকম। একসময় ছিল যখন তরুণ চলচ্চিত্রকাররা 'তথ্যচিত্র' তৈরি করে হাত পাকাতেন। পরে কাহিনিচিত্র নির্মাণে হাত দিতেন। এখন দেখি তাঁরা ছোট ছবি তৈরি করে হাত পাকান। যেমন ঋতুপর্ণ ঘোষ 'হীরের আংটি' দিয়ে, শুরু করেন চলচ্চিত্র অভিযান। কিন্তু কেন তাঁরা বোঝেন না শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণ যে কোন কাহিনি ছবির থেকে অনেক, অনেক বেশি কঠিন। অনেক জটিল।

একটি ছবি হালে বাংলার ছেলেমেয়েদের নাড়া দিয়েছিল। সে ছবির নাম 'কোণি'। পরিচালক 'অগ্রগামী' নামে খ্যাত সরোজ দে। 'কোণি'র মত উদ্দীপক, সমকালীন চারপাশ নিয়ে বাস্তববাদী ছবি খুব বেশি হয়নি বাংলা ছবির ইতিহাসে। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৮৬-তে। প্রায় কুড়ি বছর আগে। কিন্তু আজও যখন ছবিটি প্রদর্শিত হয় অনুর্ধ্ব ১৬ দর্শকরা প্রায় স্লোগানের মতই চীৎকার করে 'ফাইট কোণি, ফাইট'। ক্রীড়াজগতের বিষয় নিয়ে ছবিও বাংলায় বেশি হয়নি। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় সমৃদ্ধ 'কোণি' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজিত ছবির মধ্যে বিরল ব্যতিক্রম যা ভালো বাণিজ্য করেছে।

হাল আমলের 'পাতাল ঘর' বিরাট ঢক্কানিনাদে শিশুদের জগতে প্রবেশ করেছে। ডলবি শব্দ প্রক্ষেপণ। আধুনিকতম প্রযুক্তির ম্যাজিক চোখ ধাঁধিয়েছে। কিন্তু মন ভরিয়েছে কি?

বাংলা ছবির প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই জীবন ইতিহাসের সবচেয়ে ছোট চ্যাপ্টারের চালচিত্র পাঠকের কাছে তুলে ধরলাম।

কেন ছোটদের ছবির এই অপ্রতুলতা? এরজন্য দায়ী চিল্ড্রেন ফিলম্ সোসাইটির অপদার্থতা, আর আমাদের সিনেমা ব্যাওসায়ীদের ছোটদের ছবি সম্পর্কে অনীহা। এই কালোয়ার আর হায়দরাবাদীদের দাপটের যুগে কোথায় খুঁজে পাবো প্রমোদ লাহিড়িদের মত সংস্কৃতি ও শিল্প নিষেধিত প্রাণ প্রযোজকদের।

আর হ্যারি পটারের যুগে বুড়ো আংলারা সিনেমার যুদ্ধ জয় করতে পারবে কি?

হে মা ধরিত্রী, একটু ঠান্ডা হও

শ্রীমতী মহুয়া চ্যাটার্জী
গবেষণা আধিকারিক
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)

সকাল থেকে আজ বাপ্পার মনটা ভালো নেই। এক মাস ছুটি কাটিয়ে আজ আবার স্কুল, যা গরম পড়েছে তাতে ছুটিটা আর ক'টা দিন বেশী হলে মন্দ হত না। মা তাড়া দিচ্ছেন, 'ওরে তোর হল?' 'হ্যাঁ, যাচ্ছি,' - বাপ্পা চট্‌পট্ ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে রওনা দিল। বাপ্পার মা সুমতি দেবী ঘরের কাজকর্ম সেরে দুপুর বেলা স্নানে ঢুকলেন। এই নিয়ে দ্বিতীয় বার। উফ্ যা গরম পড়েছে, কবে যে বরুণদেব একটু কৃপা করবেন, কে জানে? সামনে এখনো ভাদ্রমাস পড়ে আছে, আর পারি না।' আপন মনেই বলে চললেন। টি. ভি. তে কাগজে দেখাচ্ছে, দুপুরে শহরের রাস্তাঘাট শুন্‌শান্। নেহাত অনুপায় না হলে কেউ আর বেরোচ্ছে না, রাস্তার পিচ গলে জুতো আটকে যাচ্ছে, তেষ্টার তাড়নায় আজে বাজে রঙিন জল খেয়ে পেটের অসুখের প্রকোপ বাড়ছে। পৌরসভা থেকে বারবার সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছে। সুমিতা দেবী ভাবেন, কয়েক বছর আগে ও তো অবস্থাটা এরকম ছিল না, এখন প্রতি বছরই যেন মনে হয়, গরমকালটা বেড়ে চলেছে আর শীতকালটা ছোট হয়ে আসছে। ঘড়ির কাঁটায় প্রায় সাড়ে চারটে, কিন্তু বাইরে রোদের ঝাঁঝা দেখে তা বোঝার জো নেই। এমন সময় দরজায় ক্রিং ক্রিং ক্রিং বেলের শব্দ, কী ব্যাপার, বাপ্পা আজ এত খুশী কেন? দরজা খুলতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হল, 'মা জানো তো, স্কুলে আরও এক সপ্তাহ ছুটি দিয়ে দিয়েছে।' 'বলিস্ কী রে, এরকম অবস্থা!'

বাপ্পার বাবা এখন আর অফিস থেকে এসে চা খান না, স্রেফ এক গ্লাস পাতিলেবুর সরবতই তাঁর কাছে অমৃত সমান। সেদিন উনি বলছিলেন, বুঝলে গিন্নি, এ সবই গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফল। 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং? তার মানে তুমি কি বলতে চাও, সারা পৃথিবী জুড়েই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে?' 'তা নয়তো কি? পৃথিবী জুড়ে লোক তো আর কম নয়। তার ওপর এই যে গাছ কাটা হচ্ছে, যানবাহনের কালো ধোঁয়া বাতাসে মিশছে, রেফ্রিজারেটর, টি. ভি., ওয়াশিং মেশিন থেকে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন বেরোচ্ছে, যুদ্ধবাজ দেশগুলো অ্যাটম্ বোম বানিয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিষ্কাশন ঘটাচ্ছে, তার ফল কে ভোগ করবে? নাঃ, সর্বং সহা বসুধার আজ আর অত সহ্যশক্তি নেই, তাই তিনিও রুষ্ট হয়েছেন আর তার তেজে আমরাও গরম হচ্ছি। তুমি ভাবতে পারো পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রতি বছর প্রায় $0.01^{0}C$ করে বেড়ে চলেছে! NASA তো বলছে, উত্তর মেরু অঞ্চলে বরফের স্তূপ না কি ক্রমশঃ পাতলা হচ্ছে। 1960 সাল থেকে আজ পর্যন্ত সেখানে প্রায় 40 শতাংশ বরফ গলে গেছে। পৃথিবীর এই ক্রমবর্দ্ধমান তাপবৃদ্ধি জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে বাতাসের আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে, এরই প্রভাবে দক্ষিণ মেরুতে প্রায়শই তুষারপাত হচ্ছে। আর অত কেন, আমাদের যে গঙ্গোত্রী হিমবাহ, যেখানে গঙ্গার উৎস - তাও তো বছরে প্রায় 23 মিটার করে দূরে চলে যাচ্ছে। কথাগুলো প্রায় এক দমে বলে গেলেন পঙ্কজ বাবু। 'তাই না কি গো?' সুমিতা দেবী বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন। 'হুম্', এতেই অবাক হয়ে গেলে? প্রকৃতির কি অদ্ভুত ব্যালেন্স দ্যাখো, একদিকে বরফ গলে সমুদ্র জলতলের সীমা বাড়ছে, বন্যার সম্ভাবনা তৈরী হচ্ছে। অপর দিকে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে নিঃশব্দে শুকিয়ে যাচ্ছে জলভূমিগুলো। মানুষ আর খাওয়ার জলটুকু পর্যন্ত পাবে না। এই তো সেদিন অফিসে মলয়বাবু বলছিলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্টে না কি বেরিয়েছে যে, বিশ্বের তাপমাত্রা আর 3^{0} - $4^{0}C$ বেড়ে গেলে বিশ্বের 85 শতাংশ জলাভূমি পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে। ভূগর্ভের জলে ইতিমধ্যেই টান পড়েছে। জলে মিশে যাচ্ছে আর্সেনিক, ফ্লোরাইড-এর মত বিপজ্জনক রাসায়নিক। অতএব, সেদিন আর খুব বেশী দেরী

নেই, যখন দেখবে এই জলকে ঘিরেই শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধ। আবার দ্যাখো, তাপমাত্রা বাড়লেই বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস বা এককোষী পরজীবি যারা এতদিন ঘুমিয়ে ছিল তারা সক্রিয় হয়ে উঠবে, আর কত যে জানা অজানা রোগের প্রার্দুভাব হবে কে জানে? আসলে আবহাওয়ার এই পরিবর্তন সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলছে। আমেরিকার মত ঠান্ডা দেশেও আজ লোক মারা যাচ্ছে কি না heat stroke - এ। আন্টার্কটিকায় ঘাস জন্মাচ্ছে। নিম্ন অক্ষাংশের অনেক প্রাণীই গরমের দাপটে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে উচ্চ অক্ষাংশের দিকে। আবার, অনেক গাছপালা, পশুপাখিই নিঃশব্দে পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

বাপ্পা এতক্ষণ চুপচাপই ছিল, নিজের পড়া তৈরী করছিল। কিন্তু কানটা এদিকেই ছিল। তাই সে হঠাৎই বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, গ্রীণ হাউস্ গ্যাস কি?' ছেলের প্রশ্ন শুনে পঙ্কজবাবু বেশ খুশী হলেন, যাক্ eco club এর দৌলতে ছেলে বেশ পরিবেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। তিনি বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলতে শুরু করলেন, আমাদের বায়ুমণ্ডলে এমন কিছু গ্যাস আছে যেগুলো কিনা সূর্য থেকে আগত ক্ষুদ্র তরঙ্গকে পৃথিবীতে আসতে দেয় কিন্তু রাত্রিবেলা পৃথিবী-থেকে তা যখন মহাশূণ্যে ফিরে যায় তখন তাতে বাধা দেয়, ফলে যে পরিমাণ তাপ দিনের বেলায় আসে, রাতে সে পরিমাণ তাপ পৃথিবী থেকে মহাশূণ্যে ফিরে যেতে পারে না। এভাবে প্রতিদিন একটু একটু করে তাপ পৃথিবীতে জমা হতে থাকে আর এভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে। এখন প্রশ্ন হল, গ্রীণ হাউস্ গ্যাস কোনগুলো? গ্রীণ হাউস্ গ্যাসের মধ্যে রয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন, মিথেন আর খুব সামান্য হলেও ওজোন। 'আচ্ছা বাবা, তাহলে কি কোন ভাবেই আমরা তাপমাত্রা কমাতে পারি না?' 'কেন পারব না?' তবে একটু সময় লাগবে আর দরকার সকলের সক্রিয় সহযোগিতা। কারণ, মনে রাখা দরকার যে, সাইক্লোনে যদি আমাদের এখানে গ্রামের পর গ্রাম ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয় তাহলে হ্যারিকেন, টাইফুন বা ক্যাটরিনা-র বিধ্বংসী গ্রাস থেকে রেহাই পাবে না বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশগুলোও। এ নিয়ে পরিবেশবিদ্‌রা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আলোচনা, চুক্তিপত্র করেছেন, যার সাম্প্রতিকতম ফলশ্রুতি হল কিয়োটো চুক্তি। এই আর্ন্তজাতিক চুক্তিপত্রে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলিকে মূলতঃ গ্রীণ হাউস্ গ্যাসের ব্যবহার সঙ্কুচিত করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। খনিজ জ্বালানীর পরিবর্তে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োগ্যাস ব্যবহারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'তা, হ্যাঁ গো, সব দেশ এটা মেনে নিল তো?' স্ত্রীর কথা শুনে পঙ্কজ বাবু হো হো করে হেসে উঠলেন, 'কি যে বলো তা হলে তো সব মিটেই যেত। কিন্তু আমেরিকা, যেখানে কি না সমগ্র বিশ্বের মাত্র 4 শতাংশ মানুষের বাস অথচ গ্রীণ হাউস্ গ্যাস উৎপাদনে যাদের অবদান এক চতুর্থাংশ তারা এখনো পর্যন্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে রাজী হয়নি।

হঠাৎ ই বাপ্পা প্রশ্ন করে, আচ্ছা বাবা, হিমবাহগুলো যদি গলতে শুরু করে তাহলে তো নদীতে জলের পরিমাণ বেড়ে যাবে, তখন নিশ্চয়ই নদীপথগুলোকে যাতায়াতের জন্য আরও বেশী করে ব্যবহার করা যাবে। পঙ্কজ বাবু সম্মতি সূচক মাথা নাড়লেন, সাথে এ-ও যোগ করলেন যে, কানাডা বা উত্তর ইউরোপের দেশগুলিতে অতিরিক্ত শৈত্যপ্রবাহের জন্য প্রতি বছরই যে প্রাণহানি হয় তার সম্ভাবনাও হয়তো কিছুটা কমবে। কিন্তু বাপ্পা, তা তো বিন্দুতে সিন্ধু। এ দিয়ে কি বিরাট ক্ষতি রোধ করা যাবে? আসলে আবহাওয়া পরিবর্তনের ফল, তা ভালোই হোক বা মন্দ, আমাদের সবাইকেই তা ভোগ করতে হবে। তাই ধরিত্রীকে জ্বলনের হাত থেকে বাঁচাতে, এগিয়ে আসতে হবে, আমাদের সবাইকেই, তাই না?

সবপেয়েছির আসর

প্রতিষ্ঠা

১৯৪৫ সালের ২৯শে জুলাই সবপেয়েছির আসর প্রতিষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক, চিত্রকর ও সম্পাদক শ্রী অখিল নিয়োগী, স্বপনবুড়ো এই নামান্তরালে - বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিতা 'সব পেয়েছির দেশ' -এর ভাবানুপ্রেরণায় সবপেয়েছির আসর নামকরণ এবং প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েকজন ভাই বোনের উদ্যোগে ও উপস্থিতিতে সবপেয়েছির আসরের কাজ শুরু হয়। ক্রমে একটি একটি করে শাখা সংগঠিত হতে থাকে। প্রখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র 'যুগান্তর' এর ছোটদের পাততাড়ি'র দপ্তরে এর মূলকেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার কাল হতে 'যুগান্তর' কর্তৃপক্ষ সবপেয়েছির আসরের মহত্তম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

আদর্শ ও তাৎপর্য

যে কোনও দেশের যে কোনও জাতি, বর্ণ, শ্রেণী, গোষ্ঠীর ছেলেমেয়ে সব পেয়েছির আসরে যোগদান করতে পারে। ষোলো বৎসর বয়ঃ সীমার মধ্যে সকলের প্রবেশাধিকার অবারিত।

বিদ্যালয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে, সামাজিক জীবনের সঙ্গে সংহতি রক্ষা করে-দৈহিক, মানসিক নৈতিক শিক্ষাদর্শে উদ্বুদ্ধ করা এবং দেশাত্ববোধ ও মানব-কল্যাণের চেতনায় সঞ্জীবিত করা সবপেয়েছির আসরের মুখ্যতম আদর্শ।

সামাজিক মূল্যায়ন, সুস্থ সংস্কৃতি বোধ, পরিশীলিত রুচি সম্পর্কে সচেতন করা ও রাখা সবপেয়েছির আসরের মূল উদ্দেশ্য।

জীবনে যা-কিছু পাবার আছে, তাকে অর্জন করার প্রয়াস ও বহন করার প্রবৃত্তি, সঙ্গে সঙ্গে দেবার জন্য ঔদার্যপূর্ণ মনোবৃত্তি গঠন করা সবপেয়েছির আসরের শিক্ষানীতির লক্ষ্য।

রাজনীতির দলীয় প্রভাবমুক্ত, ধর্মীয় অন্ধতা বর্জিত, মানবিক মূল্যবোধ জাগরণে সংকল্পবদ্ধ - সবপেয়েছির আসর সর্বথা ও সর্বদা শিশু কিশোর কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। বিধিবদ্ধ সুচিন্তিত সুপ্রণীত সংবিধান এর দ্বারা সবপেয়েছির আসর নিয়ন্ত্রিত।

প্রসার

সামান্য সূচনার ভিতর দিয়ে যে সবপেয়েছির আসরের কাজ শুরু হয়েছিল অচিরেই সেটি অসামান্য প্রসারলাভ করে। বেশ দ্রুত এবং দীপ্তভাবেই শাখা সংগঠিত হতে থাকে দিকে দিকে। স্বপনবুড়ো প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠাবার সমূহ সম্ভাবনাকে সকলের সামনে এনে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একদল নিঃস্বার্থ, কর্মব্রতী, শিশুদরদী, সহৃদয় কর্মী এসে এই প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করেন দেশময়। উত্তর কলকাতার একটি গলিতে প্রথম আরম্ভ হয়ে সবপেয়েছির আসরের শাখা ও কর্মধারা প্রসারিত হয়ে যায় রাজধানী পর্যন্ত এমনকি বিদেশেও।

শিশু, কিশোর, যুবা, পৌঢ়, বৃদ্ধ সকল বয়ক্রমের মানুষ এসেছে এখানে; হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, আস্তিক, নাস্তিক সকল ধর্ম্ম চেতনার মানুষ আছে এর মধ্যে; ধনী, দরিদ্র, অভিজাত, অবহেলিত, গ্রাম্য, শহুরে সকল স্তরের মানুষ সম্মিলিত হয়েছে এর সীমানায়। প্রকৃতপক্ষে সবপেয়েছির আসর আজ দিকেদিকে, জনে জনে, মনে মনে প্রসারিত হয়ে গেছে। বঙ্গে, বর্হিবঙ্গে এর শাখা বিস্তারিত হয়ে চলেছে।

এ দেশের শিশু ও কিশোর কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বলতে এবং সুশৃঙ্খল, বিধিবদ্ধ, সুসংহত ছোটদের অন্যতম বৃহত্তম সংগঠন বলতে বস্তুত এককথায় সবপেয়েছির আসরকেই বোঝায়। তার প্রমাণ সর্বৈব আছে বলে প্রচার নিষ্প্রয়োজন।

বিভিন্ন পল্লীতে, গ্রামে, ছোট শহরে, বড় নগরে, বিদ্যালয়ে, বৃহৎ সংগঠনের শিশু বিভাগে সবপেয়েছির আসর স্থির আদর্শ নিয়ে, দৃঢ় কর্মসূচী নিয়ে দিন দিনে প্রসারিত হয়ে চলেছে।

সকল স্তরের ও বয়সের কর্মীর অক্লান্ত, অসূয়াহীন অফুরন্ত অননুকরণীয় শ্রম, ত্যাগ ও নিষ্ঠাই সবপেয়েছির আসরের সমস্ত কর্মোদ্যমের উৎস এবং প্রসারের মূল কারণ।

কর্মধারা

মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় হল, তার কর্ম। আদর্শরূপে এই বাণী শিরোধার্য করে কর্মীর দল ব্রতী হয়েছে সবপেয়েছির

আসরের কর্মধারাকে সুফলপ্রসূ করে তুলতে। ছোটদের বড় হয়ে উঠতে সহায়তা করার জন্য যত প্রকারের কর্মসূচী গহণ করা আবশ্যক সবপেয়েছির আসর সেইদিকে দৃষ্টি রেখে প্রথম দিন থেকে ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহ কাজ করে চলেছে।

নিত্য নিয়মিত খেলাধূলা, কুচকাওয়াজ, ব্রতচারী, খো-খো, কাবাডি, লাঠি, দেশী-বিদেশী ড্রিল-খেলা যেমন দেহের পটুতা বিধানের জন্য চর্চা করা হয়, তেমনই সাহিত্য কর্মশালা, চিত্রাঙ্কন শিক্ষা, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটকাভিনয়, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, আবৃত্তি, লোকনৃত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মানসিক বিকাশ এবং সুষ্ঠ বলিষ্ঠ সংস্কৃতির চেতনার উৎকর্ষ সাধনের কর্মসূচী পালন করা হয়। শৃংখলাবদ্ধ সমষ্টিগত গঠনমুখী ত্যাগব্রতী চিন্তা ও কার্যধারায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষণ শ্রেণী, শিক্ষাশিবির, সংঘমিত্র সম্মেলন, কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন, কর্মী শিবির, বার্ষিক শিবির-আবার সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয় পত্রিকা, স্মরণিকা, শিক্ষণ-পুস্তিকা, নির্দেশক গ্রন্থাদি। বার্ষিক উৎসব, নববর্ষ উৎসব, পতাকা দিবস, বার্ষিক শোভাযাত্রা, সত্যসেবী পরীক্ষা, প্রবেশিকা-মধ্যমাদি পরীক্ষা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সমস্ত বছরের কর্মধারার উৎকর্ষ সম্ভাবনা এবং সামগ্রিক সাফল্যের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়। সর্বপ্রকারের কর্মধারার মূলতম লক্ষ্য হল ছোটদের বড় হয়ে উঠবার প্রকৃত পথ নির্দেশ।

সারা বছরের প্রতিটি দিন সবপেয়েছির আসরের কোনো না কোনো শাখায় কিছু না কিছু কাজ হয়েই চলেছে। এইটিই সবপেয়েছির আসরের কর্মধারার শ্রেষ্ঠ জীবন্ত উজ্জ্বল নিদর্শন।

গৌরব

সবপেয়েছির আসর দীর্ঘকালব্যাপী কর্মসাধনার ক্ষেত্রে দেশ বিদেশের জ্ঞানী, গুণী, নেতা, শিল্পী প্রভৃতির উপস্থিতি লাভে গৌরব বোধ করেছে চিরদিন। বিভিন্ন সময়ে বিবিধ অনুষ্ঠানে, সম্মেলনে, প্রদর্শনীতে, প্রতিযোগিতায়, শোভাযাত্রায় যাঁরা উপস্থিতি হয়ে আশীর্বাণী দিয়ে উৎসাহ দান করেছে, তাঁদের মহানুভবতা ও সহানুভূতির জন্য সবপেয়েছির আসর কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞ।

অনেক বছরের বিভিন্ন উৎসবে দেশের বড় সাহিত্যিকেরা ছোটদের জন্য নাটক অভিনয় করেছেন, বড় শিল্পীরা ছোটদের গান শুনিয়েছেন, বিদেশী ভাই-বোনেরা এসে তাদের দেশের অনুষ্ঠান পরিবেশন করে গেছেন। গৌরবে ভরে গেছে সবপেয়েছির আসরের ইতিহাস। শত শত প্রাক্তন ভাইবোন কর্মরত আছে বিভিন্ন রূপে, যাদের মধ্যে আছে-উচ্চপদস্থ কর্মচারী, অধ্যাপক, ডাক্তার, শিক্ষক, ইঞ্জিনীয়ার, শিল্পী, খেলোয়াড়, স্কলার, সাঁতারু, ব্যবসায়ী, অভিনেতা প্রভৃতি। তারা সকলেই সবপেয়েছির আসরের গৌরব। সেই পথ অনুসরণ করে এখনকার ভাই-বোনেরা অগ্রসর হচ্ছে এবং গৌরবময় ঐতিহ্যধারাকে অব্যাহত রেখে চলেছে।

পূর্ণ লক্ষ্য

সবপেয়েছির আসরের আদর্শ, কর্মধারা আজ চতুর্দিকে প্রসারিত, প্রতিষ্ঠিত এবং প্রশংসিত। তথাপি সামগ্রিক পরিচালনায় নিয়োজিত কেন্দ্রীয় কর্মী পরিষদ আত্মপ্রসাদে কর্মবিস্মৃত হননি। ত্যাগ, নিষ্ঠা ও শ্রমের সমন্বয়ে আরো কি কি করবেন, এই ভাবনা তাদের আছে। অগ্রগতিশীল কর্মধারার পূর্ণ লক্ষ্য সংক্ষেপে এই ঃ কেন্দ্রীয় শিশু গ্রন্থাগার, আধুনিক শিশু-মঞ্চ, শিশু চিকিৎসালয়, শিবিরের জন্য স্থায়ী প্রাঙ্গন, চিত্র প্রদর্শনশালা, বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র ইত্যাদি। প্রতিটি শিশুর শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, নৈতিকতায়, দেশাত্মবোধে উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক সাধনাই সবপেয়েছির আসরের পূর্ণ কর্মসূচী আর তাতেই স্থায়ী সিদ্ধিলাভ করা পূর্ণ লক্ষ্য।

আসর পতাকা

প্রতি আসরে পতাকা রাখা বাধ্যতামূলক

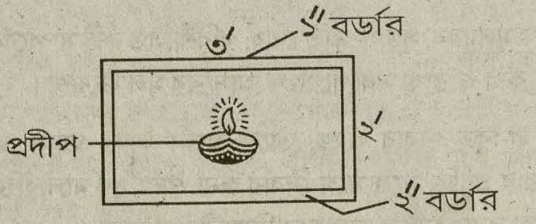

আসরের প্রতিদিনের কাজের শুরুতে, উৎসব ও অনুষ্ঠানে আসর পতাকা উত্তোলন করা একান্ত কর্তব্য। পতাকা উত্তোলনের সময় সকল সোনারকাঠি ও কর্মী প্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে পতাকাকে সম্মান জানাবে এবং 'শুভম্ সবপেয়েছির আসর' ধ্বনি দিয়ে

হাত জোড় করে নত হয়ে পতাকাকে প্রণাম করবে। পরে সমবেতভাবে পতাকাগীতি গাইতে হবে। প্রতিদিন সোনারকাঠি ও কর্মীরা পালাক্রমে পতাকা উত্তোলন ও অবনমন করবে। পতাকার বিবরণ ও মাপ দেওয়া হল।

পতাকার বিবরণ

পতাকার দৈর্ঘ্য ৩ ফুট ও প্রস্থ ২ ফুট। পতাকার জমি সাদা, মাঝখানে লাল রঙের আঁকা উচ্চশিখা যুক্ত প্রদীপ। শিখার প্রতি পাশে পাঁচটি করে লাল আলোর ছটা থাকবে। বর্ডার হবে নেভি ব্লু রঙের। তিন দিকে ১ ইঞ্চি করে চওড়া এবং নিচে দুই ইঞ্চি চওড়া।

আসর পতাকার তাৎপর্য

পতাকার শ্বেতভাগ পবিত্রতা ও শান্তির প্রতীক। বর্ডারের নীল রঙ ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। রক্ত প্রদীপ জ্ঞানের বিকাশ সূচিত করে।

প্রতীক

প্রদীপ - দশ দিকে দশটি শিখা বিচ্ছুরিত, সাদা জমিতে মধ্যস্থলে প্রদীপ।

সোনারকাঠি ও কর্মীদের স্কার্ফ

প্রতি প্রতিষ্ঠানের স্কার্ফ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গৌরব সূচিত করে। সবপেয়েছির আসরে বহুদিন ধরে স্কার্ফের প্রচলন আছে। ১৯৭৪ সাল থেকে সবপেয়েছির আসরে কর্মীদের জন্য নতুন স্কার্ফের প্রবর্তন করা হয়েছে। কর্মীরা নিজস্ব আসরের ও মূলকেন্দ্রের শিবিরে, অনুষ্ঠানে, সমাবেশে ও অভপ্রদর্শনীতে এবং সংঘগত অন্যান্য কর্মে উক্ত স্কার্ফ পরিধান করে আসরের গৌরব ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করবে। নিচে কর্মীদের ও সোনারকাঠিদের স্কার্ফের বিবরণ দেওয়া হল।

বিবরণ

এক গজ বহরের একগজ সাদা কাপড়কে কোণাকুনিভাবে দু'ভাগ করলে দু'টি স্কার্ফ পাওয়া যাবে। এর প্রতিটির তিন দিকে এক ইঞ্চি চওড়া করে নেভী ব্লু কাপড়ের বর্ডার দিতে হবে। কর্মীদের স্কার্ফের এই বর্ডারের এক ইঞ্চি বাদ দিয়ে আবার তিন দিকে ভেতর ১/২ ইঞ্চি চওড়া মেরুন রংয়ের কাপড়ের বর্ডার দিতে হবে। সাদা কাপড়ের মাঝখানে শিখাযুক্ত লাল প্রদীপ অঙ্কিত থাকবে। শিখার প্রতিপাশে পাঁচটি করে আলোর ছট থাকবে।

সোনারকাঠিদের স্কার্ফে শুধু মেরুন বর্ডার থাকবে না। আর সবই এক, শুধু প্রয়োজনানুযায়ী আকার ছোট হবে। এই স্কার্ফ ১৯৬০ সাল থেকে চালু হয়েছে।

পোষাক

সোনারকাঠি ভাই ঃ

সাদা হাফ প্যান্ট, হাফ সার্ট, সাদা কেড্‌স, সাদা মোজা, স্কার্ফ, ব্যাজ, ওগোল।

সোনারকাঠি বোন ঃ

সাদা ফ্রক, সাদা কেড্‌স, সাদা মোজা, ওগোল, স্কার্ফ, ব্যাজ, সবুজ ফিতে।

কর্মী ভাই ঃ

সাদা ফুল প্যান্ট, সাদাফুল সার্ট, সাদা কেড্‌স, সাদা মোজা, ব্যাজ, স্কার্ফ (কর্মী), ওগোল।

কর্মী বোন ঃ

লালপেড়ে সাদা শাড়ি, কলার দেওয়া লম্বা ঝুলের লাল ব্লাউজ, কর্মী স্কার্ফ, ওগোল, সাদা কেড্‌স, সাদা মোজা, সবুজ ফিতে।

শিবিরে শিক্ষণ শ্রেণীর পোষাক ঃ

ভাই - হাফ প্যান্ট, হাতাদেয়া গেঞ্জি, কেড্‌স, মোজা সবই সাদা। কর্মী ভাইদেরও একই পোষাক। বোনেদের সাদা সালোয়ার কামিজ। কেড্‌স, মোজা সবই সাদা। কর্মী বোনেদেরও একই পোষাক।

- আসর ও মূলকেন্দ্রের উৎসব অনুষ্ঠানে আসর পোষাক পরে যোগ দিতে হয়।
- ব্যাজ সোনারকাঠি ও কর্মীদের আলাদা। ওগোল একই। মূলকেন্দ্র থেকে সরবরাহ করা হয়।

- প্রত্যেককেই স্কার্ফে ওগোল পরতে হবে। ওগোল মূলকেন্দ্রে পাওয়া যায়।

শিবির যেতে হলে

শিবিরে যেতে হলে কি কি নিতে হবে নতুনরা জানেই না, পুরোনোরাও ভুল করে থাকে। সবার ভালোর জন্য তাই একটা তালিকা দেওয়া হল। প্রথমে পোষাকের কথায় আসা যাক। আসরের পুরো পোষাক চাই। ৩ দিনের বেশি সময়ের শিবির হলে দু'প্রস্থ পোষাক হলে ভাল হয়। অবশ্যই দেখে নেবে বোতাম, সেলাই ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা। ব্যাজ, সাদা কেড্‌স, মোজা নিতে ভুলো না। ট্রেনিং -এর সময় পরার জন্য সোনারকাঠি ভাইও কর্মীরা সাদা হাফ প্যান্ট (শর্টস্ নয়) ও মূলকেন্দ্রের গেঞ্জি নেবে। যোগাসনের জন্য সোনারকাঠি বোনেরা, কর্মী বোনেরা সালোয়ার নেবে। ব্রতচারীর জন্য ভাইয়েরা ধুতি, শালু এবং বোনেরা লালপেড়ে সাদা শাড়ি নেবে।

শিবিরে অবসরে ঘরোয়া শ্রেণীতে পরার জন্য সাধারণ পোষাক নিতে হবে। সে সব সুরুচি সম্পন্ন হবে। পায়ের চটি / শ্লিপার নিও। শিবিরে প্রকাশ্যে লুঙ্গি জাতীয় পোষাক পরা উচিত নয়। শীতকালে শীতবস্ত্র নিতেই হবে। সান্ধ্যামজলিসের জন্য চোসত্া, পান্‌জাবি, ওড়না, ছাপা শাড়ি, টুপি, ম্যাক্সি, মুখোশ ইত্যাদি নেবে। ওসব পরে অনেক কিছুই সাজা যায়। খাবার জন্য স্টিলের থালা, মগ (কাঁচের বা চিনা মাটির ডিস, কাপ, গ্লাস কখনোই নয়।) গরমকালে হলে জলের বোতল নিতে ভুলবে না কিন্তু। শোবার জন্য শতরঞ্চি, চাদর, বালিশ, কম্বল, মশারি ইত্যাদি নিতে হবে বেডিং বেঁধে। প্রত্যেকের আলাদা বিছানা নিতে হবে। সুটকেশ ব্যাগ যাই নাও না কেন, মজবুত দেখে নিও। পথে ধকল সইতে হবে যে। সুটকেশের ওপর তোমার নাম ঠিকানা লিখে নিও। দড়ি, সুঁচ, সুতো, বোতাম, কেড্‌সের খড়ি, ব্রাশ, পেষ্ট, তেল, সাবান, আয়না, চিরুনি, ক্রীম (বোরোলীন জাতীয়), টর্চ, খাতা-কলম, হাতের কাজের টুকিটাকি, ব্যাণ্ডের কাঠি, বাঁশি, লাঠি খেললে লাঠি, কাঠি নৃত্যের কাঠি, ঢোল, মাউথ অরগান (যদি তুমি বাজাতে জানো) ইত্যাদি। একটা ছোটখাট সংসার-তাই না। তোমার সব সামলানোর দায়িত্ব কিন্তু তোমারই। হারিয়ে যেতে পারে এমন মূল্যবান জিনিস না আনাই ভাল। আর তোমার আসরের ফেষ্টুনটি আনতে ভুল না কিন্তু?

একটি আসর গড়তে হলে

আপনার অঞ্চলে সবপেয়েছির আসরের একটি শাখা সংগঠন গড়তে হলে কমপক্ষে ২০ জন ছেলেমেয়ে চাই। এদের বয়স হবে ১৬'র মধ্যে। এদের বলা হয় 'সোনার কাঠি'।

একটি খেলার মাঠ অবশ্যই চাই। চাই কিছু শিশুদরদী সমাজসেবী মানুষ। তরুণ যারা কাজ করবেন ছোটদের নিয়ে, তাদের বলা হবে 'কর্মী'। এঁদের নেতৃত্ব দেবেন 'সংঘমিত্র'। সাধারণ সম্পাদকের মত পদ। এঁর বয়স হবে ২৫এর বেশি। ইনি অভিভাবকও হতে পারেন।

বিদ্যালয়, নাচ, গান, অঙ্কন, যোগব্যায়ামের স্কুল ও যে কোনো শিশু প্রতিষ্ঠান সবপেয়েছির আসরের শাখা সংগঠন গড়তে পারবে। প্রথমে একটি সাদা কাগজে আবেদন পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে এবং আসর সংবিধান (১০ টাকা) ও আসর গড়ার আবেদন পত্র (৫ টাকা) সংগ্রহ করতে হবে। কমপক্ষে পাঁচজন অভিভাবক বা স্থানীয় বিশিষ্ট জনের অনুমতিসূচক স্বাক্ষর মূলকেন্দ্রের আবেদন পত্রে দিতে হবে। কর্মী বা অভিভাবক যাঁরাই আসরের সঙ্গে যুক্ত হবেন — তাঁদের সকলকেই হতে হবে অরাজনৈতিক, সংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল মনের মানুষ; আর সব সময় থাকতে হবে ধর্ম বর্ণ বিভেদের ঊর্ধ্বে। সকল শিশুর জন্য আসরের দ্বার খোলা। একটি নাম ঠিক করতে হবে, তারপর যোগ হবে — সবপেয়েছির আসর। আবেদনপত্রের ভিত্তিতে পরিদর্শন হবে। আসর গড়ার মত সাংগঠনিক শক্তি ও পরিবেশ থাকলে তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে মূলকেন্দ্রের কার্যকরী সমিতি প্রস্তাবিত সংগঠনকে সবপেয়েছির আসরের শাখা হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেবে। অনুমতি পাওয়ার পর ২৫ টাকা অনুমোদন দক্ষিণা, বার্ষিক চাঁদা ২৫ ও সংগঠনী ২০ টাকা, সংগঠন প্রতিষ্ঠাতা স্বপনবুড়োর ছবি ১৫ টাকা, সাকুল্যে ১০০ জমা দিয়ে অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হবে। এরপর সোনারকাঠির মাথা পিছু ১ টাকা চাঁদা দিয়ে সভ্যপত্র (সোনারকাঠি) সংগ্রহ করতে হবে সাদা কাগজে নামের তালিকা ও বয়স (২ কপি) জমা দিয়ে। কর্মীদের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ৫ টাকা দিয়ে পরিচয় পত্রের জন্য আবেদন করে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে। শাখা আসরটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূলকেন্দ্রে কাছে দায়বদ্ধ। নিজস্ব সংগঠনটি পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীন একটি নির্বাচন সমিতি শাখা সংগঠনটি পরিচালনা করবেন। সংঘমিত্র হবেন প্রশাসনিক প্রধান। সোনারকাঠিদের নেতৃত্ব দেবে 'সত্যসেবী'। মূলকেন্দ্র গৃহীত সত্যসেবী পদাধিকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা এই পদে নির্বাচিত হবে। নতুন আসরের ক্ষেত্রে অস্থায়ী বিকল্প ব্যবস্থা আছে। মূলকেন্দ্র কোন শাখা আসরকে সরাসরি আর্থিক সাহায্য দেয় না। পতাকা দিবসে সংগৃহীত অর্থের ৪৭.৫ ভাগ অনুদান শাখা আসরকে দেওয়া হয় ও প্রশিক্ষণ শিবির, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচীতে যোগ দেওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকে। শিশুদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য রেল কনসেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া সাংগঠনিক সাহায্য দেওয়া হয়। আসরের খবরাখবর ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'আসর সন্দেশ' বিনামূল্যে দেওয়া হয়। শিক্ষণ সহযোগী শিক্ষণ মুকুর, খেলার ছড়া ও অন্যান্য পুস্তিকা সংগ্রহ করতে হবে।

সবপেয়েছির আসর সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। এসব জানা ছাড়াও আসর গড়তে হলে সংবিধানটি অবশ্যই পড়তে হবে। বিস্তারিত জানতে আপনার কাছাকাছি কোন শাখা আসর, আঞ্চলিক সংগঠন অথবা মূলকেন্দ্র/বিকাশকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

মনে রাখবেন আপনার অঞ্চলে একটি শাখা আসর গড়ে তোলার মানেই হল — সুস্থ সুন্দর পরিবেশে শিশুদের বড় হবার পথে উৎসাহ দেওয়া।

OUR AIMS

S portsmanship is our principle.
Sabpayechir Asar live to behave like a real sportsman.

P atriotism is our Aim.
Sabpayechir Asar trains to become Patriot.

A ssociation is our target.
Sabpayechir Asar loves all association which are good.

CAMP

C ollective Spirit and Cleanliness.

A ctivity and Adventure.

M aintenance and Making things.

P hysical Health and Pleasantness.

সংকল্প বাক্য

শিক্ষা নেবো সবার ঠাঁই
শক্ত দেহ গড়তে চাই।
ছেলেমেয়ে সব সমান
এই আসরের রাখবো মান!
গড়বো সবল স্বেচ্ছাদল
সংগঠনে মাতবি চল।
জাতিভেদ আর নাইরে নাই
মানুষ হতে চাই সবাই
সত্য পথে চলবি চল —
ঈশের আশিস্ মোদের বল।।

SAB PAYECHIR ASAR

Foundation

Sab Payechir Asar was established on 29th July, 1945 by the late Akhil Neogi with the pen-name 'Swapan Buro'. Our founder was an eminent writer, specially in the field of Children's literature. He was a talented artist, a successful editor, and above all a great visionary. Choice of the name 'Sab Payechir Asar' was inspired by the noble spirit contained in Rabindranath Tagore well-known poem 'Sab Payechir Desh'. The Asar started functioning on the strength of the initiative and jealous efforts of a handful of young boys and girls. Gradually the movement gathered momentum and branches were set up one after another in different parts of the country.

Aims and Characteristics

The main aim of Sab Payechir Asar is to help children grow as creative and successful citizens of a secular, democratic and egalitarian society rich in scientific temper and cherished human values. For attaining this goal, Sab Payechir Asar, both at the main centre and through the numerous affiliated branch units, carries on regular field and indoor activities designed to strengthen physical, mental and social health of children and adolescents.Our programmes seek to enhance their social consciousness, sensitise them to contemporary issues and refine their aesthetic sense. Our courses of joyful learning augment their physical abilities including skill in sports and games, and nurture their talents in various cultural activities. Through educational tours and training camps the children learn the value of collective living in the spirit of sharing and caring. We may humbly submit that our multidimensional endeavour has brought us recognition as a movement supplementary to school education. We also claim to be a non-political, non-religious and non-profit making voluntary social venture.

Membership

Membership of Sab Payechir Asar is open to all children in the age-group of 5 to 16 years irrespective of caste, creed, religion, language or nationality. We call these members 'Sonar-Kathis' which means 'golden sticks'.

Expansion

While celebrating the Diamond Jubilee of our beloved Asar, it is fascinating for us to go down memory lane and recount its evolution since a modest beginning 60 years ago. With branches spread over a wide geographical area our message has crossed the national boundaries. We have developed cordial relation with similar organisations of several countries abroad. A few of our neighbouring states have, in fact, opened branches of Sab-Payechir Asar for their children. Our Sonarkathis come from all Strata of social life rich and poor, urban and rural. Our affiliated units are working in villages, towns and big cities. In many cases our units are considered as a wing of schools and also as childrenis sections of large clubs and associations. It is really gratifying for us to note that a large number of eminent persons in responsible positions were Sonarkathis in their childhood days. They still cherish happy memory of those golden years.

Constitution

The structure and function of Sab Payechir Asar — both at the Main Centre and in the branch units — are guided and regulated by its own constitution. This well-designed document was adopted for facilitating our journey towards the goal. Times are changing. Every now and then new opportunities open up; new problems also raise their heads. We try to amend the constitution and modify and re-design our programmes in order to promote the positive changes and, at the same time, resist the harmful trends of the modern society.

Areas of Work

Following the ideal of basic education, our goal is to develop every child as a complete human being. Naturally our activities are planned to focus mainly on the essential co-curricular components of school education. Major part of our programmes relates to physical training including various types of sports and games. Value-loaded cultural activities are undertaken to enrich the children's aesthetic taste and elevate their moral standards. Discussions, debates and contests on different social issues are arranged to broaden the horizons of their knowledge, sharpen their thought process, awaken social consciousness which are reflected in their attitude and behaviour.

Our day-to-day work schedules also include classes in music, dance, recitation, general knowledge, drawing and painting etc. Our social service department organises blood-donation camps, relief work during natural disasters, literary classes for the under-privileged children. We arrange seminars and 'meet-the-scientist' sessions to arouse the members' interest and awareness about different aspects of environment - both physical and social. The week long Annual Training Camps organised by us in different districts bring to us a great opportunity of providing centralised training, demonstration and evaluation of the outcome of our efforts. More than a thousand boys and girls from units spread over the country spend these seven days of rigorous training and disciplined camp life in a spirit of togetherness. Fraternal delegates from abroad also join these camps and offer scope of exchange of ideas. Dignitaries from all walks of life pay visit to our camp and inspire us with their words of goodwill. On the concluding day, the members find it difficult to hold back tears. These camps are unique occasions for 'learning to live together' as recommended by the famous Dellors Commission in its report titled 'learning : The Treasure within'.

With a view to strengthening our organisation, we arrange consultation and training sessions for organisers, workers and trainers at branch, zonal and central levels. To disseminate our views, plans and programmes, we publish journals, sovenirs, training mannuals and guide books.

Task Ahead

The we have been able to meet some of the felt needs of society is a matter of satisfaction for us, but not complacence. We are aware that in this age of rapid changes marked by erosion of values, we must run faster and faster in order to stay in the some place. We are trying to be pro-active and to gear up our organisation so as to meet the challenges of tomorrow by updating and diversifying our programmes. Our Central Children's Home at James Long Sarani - a long-cherished dream of Swapanburo - is gradually shaping into a child health care unit, courtesy Rotary Club of Barisha. We are arranging dormitory facilities there for children who often have to stay in Kolkata for a few days for medical or educational purposes. We are proceeding with a proposal to set up a modest auditorium in this building for holding classes in performing art and occasional cultural programmes. We have already started work on building a permanent camp-site in our own piece of land in Madari village in the district of 24 Parganas (North).

All our efforts are directed towards serving the society, and we are confident that society would nor long behind in extending its support and cooperation for achieving our mission.

জাতীয় পতাকা ও জাতীয় প্রতীক

ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকার রং গৈরিক, সাদা ও সবুজ এবং ইহা সমান্তরাল রঞ্জিত। পতাকার উপরিভাগ গৈরিক, মধ্যে সাদা, নিম্নে সবুজ। সাদা অংশের মধ্যস্থলে চব্বিশটি স্পোক যুক্ত একটি চক্র আছে। সারনাথে অশোকস্তম্ভের চক্রের এটি একটি হুবহু প্রতিচ্ছবি। জাতীয় পতাকার প্রত্যেকটি রং -এর নিজস্ব অর্থ আছে। যথা গৈরিক বর্ণ সাহস ও ত্যাগের প্রতীক। শ্বেতবর্ণে সত্য ও শান্তির প্রকাশ এবং বিশ্বাস ও শৌর্যের ইঙ্গিত সবুজ বর্ণে। চক্রটি গাঢ় নীল রঙের, প্রগতির প্রতীক। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ঐক্য ও মর্যাদার প্রতিমূর্তি এই জাতীয় পতাকা।

পতাকা উত্তোলন ও অবনমন

একমাত্র কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ভবনগুলিতে প্রত্যহ জাতীয় পতাকা উড্ডীন থাকবে। কেন্দ্র ও রাজ্যমন্ত্রীগণ ও আইনসভার অধ্যক্ষগণের বাসভবন এবং দূতাবাসগুলিতে পতাকা উত্তোলিত থাকবে। স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস প্রভৃতি বিশেষ উপলক্ষ্যে এবং অন্যান্য জাতীয় উৎসবের দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলনে কোন বাধা নেই।

জাতীয় পতাকা সাধারণতঃ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উড্ডীন থাকে, তবে কোন বিশেষ কারণে যদি সূর্যাস্তের পর বা রাত্রে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হয় তাহলে উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা করা উচিত যাতে করে পতাকাটি ভালভাবে দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে আসর পতাকা উড্ডীন রাখার নিয়মও জাতীয় পতাকার ন্যায়। তাই সূর্যাস্তের পর আসর পতাকা উড্ডীন রাখতে হলে পতাকার সামনে উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা কর্তব্য, যাতে পতাকাটি ভালভাবে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।

জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান

১) জাতীয় পতাকা কারো সামনে অবনমিত হবে না।

২) কোন পতাকা বা প্রতীক জাতীয় পতাকার উর্ধ্বে বা ডাহিনে থাকবে না।

৩) অন্যকোন পতাকার (যেমন আসর পতাকা) সংগে উত্তোলনের সময় জাতীয় পতাকা সব সময় দক্ষিণে থাকবে। শোভাযাত্রায় বহন করার সময় পতাকা সব সময় পতাকা বাহকের দক্ষিণ স্কন্ধে থাকবে এবং শোভাযাত্রার পুরোভাগে নিয়ে যেতে হবে।

৪) অন্যান্য পতাকার সংগে উত্তোলনের সময় জাতীয় পতাকা সবার আগে উত্তোলিত হবে এবং সবার পরে অবনমিত হবে।

৫) মণ্ডপসজ্জায় বা বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে জাতীয় পতাকা কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়।

অর্ধোত্তোলন - কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে বা জাতীয় শোকের দিনে জাতীয় পতাকা অর্ধোত্তোলিত হয়। অর্ধোত্তোলনের জন্য প্রথমে জাতীয় পতাকা দণ্ডের অগ্রভাগ পর্যন্ত তুলতে হবে এবং তারপর দণ্ডের মাঝামাঝি জায়গায় নামিয়ে আনতে হবে।

জাতীয় প্রতীক - জাতীয় প্রতীকেরও বিশেষ অর্থ আছে। সিংহ - শ্রেষ্ঠত্ব ও নিয়ন্ত্রিত শক্তির, বৃষ-দৃঢ়তা ও শ্রমশীলতার এবং অশ্ব - শক্তি, বিশ্বস্ততা, গতির প্রতীক।

'সত্যমেব জয়তে' (একমাত্র সত্যেরই জয় হয়) এই সুভাষিতের মধ্যে আমাদের জীবন দর্শন বিবৃত।

সবপেয়েছির আসরে বিভিন্ন সময়ের মূলসত্যসেবী

১৯৪৭-৫০	শ্যামল দেব
১৯৫১	বুদ্ধদেব চক্রবর্তী
১৯৫২	রমাকান্ত দত্ত
১৯৫৩	শ্যামল দেব
১৯৫৪-৫৫	বুদ্ধদেব চক্রবর্তী
১৯৫৬	অজিত বসু
১৯৫৭	উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫৮-৫৯	সৌরেন রায়চৌধুরী	১৯৮৪-৮৫	অপূর্ব গঙ্গোপাধ্যায়
১৯৬০	বুদ্ধদেব চক্রবর্তী	১৯৮৬-৮৭	জয়ন্ত দেশমুখ্য
১৯৬১-৬৩	অজিত বসু	১৯৮৮-৮৯	অপূর্ব গঙ্গোপাধ্যায়
১৯৬৪-৬৬	বুদ্ধদেব চক্রবর্তী	১৯৯০-৯১	প্রদীপ রায়
১৯৬৭-৬৮	সুনীল সেনগুপ্ত	১৯৯২-৯৬	জয়ন্ত দেশমুখ্য
১৯৬৯-৭১	অমল মুখোপাধ্যায়	১৯৯৭-৯৮	সোমেশ ভুঁইঞা
১৯৭২-৭৩	অনিল চট্টোপাধ্যায়	১৯৯৯-২০০০	শ্রীদাম সাহা
১৯৭৪-৭৭	(অ্যাডহক) সৌরেন রায়চৌধুরী	২০০১-২০০২	দিলীপ চক্রবর্তী
১৯৭৮	(অ্যাডহক) সৌরেন রায়চৌধুরী	২০০৩-২০০৪	বিশ্বজিৎ খাস্তগীর
১৯৭৯-৮১	কিরণশংকর চট্টোপাধ্যায়	২০০৫-২০০৬	মৃণাল ব্যানার্জী
১৯৮২-৮৩	প্রদীপ রায়		

সবপেয়েছির আসর প্রকাশনা

সংগঠনী	বার্ষিক	১০ টাকা
শিক্ষণ মুকুর		২৫ টাকা
সংবিধান	শাখা আসরের জন্য	১০ টাকা
শিক্ষণ দীপিকা	সিলেবাস বই	১০ টাকা
খেলার ছড়া	ছড়া সংকলন	১০ টাকা
প্রেরণা	ভঙ্গীগীতি সংকলন	১০ টাকা
খেলা আর খেলা	খেলার বই	১০ টাকা
আসর সন্দেশ	ত্রৈমাসিক মুখপাত্র	১০ টাকা
সব সুরের দেশে	গানের ক্যাসেট	৩০ টাকা
সোনারকাঠি ব্যাজ		২ টাকা
কর্মী ব্যাজ		২ টাকা
ওগোল		২ টাকা
সদস্য পত্র		২ টাকা
কর্মী পরিচিতি পত্র		৫ টাকা
স্বপনবুড়োর ছবি		১৫ টাকা

কেন্দ্রীয় সংগঠক ও শিক্ষক পর্ষদ

২০০৪- ২০০৫

কেন্দ্রীয় শিক্ষকমন্ডলী ঃ সর্বশ্রী অনুপকান্তি উকিল, প্রণব রায়, প্রণব বসু, তপন সাহা, পঙ্কজ সরকার, তিমির বরণ সরস্বতী, দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী, বিকাশ প্রামানিক, গণেশ মুখার্জী, দিলীপ দাস, গৌতম সূত্রধর, গণেশ হালদার, সুব্রত কর্মকার, শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, বীণা পাল, ডঃ ফাল্গুনী গুপ্ত মজুমদার, সুজিত দে, শাশ্বতী ঘোষ, চন্দন শূররায়, তারক মজুমদার, আজগড় আলী, নবীন সেনগুপ্ত, সৌমেন সাহা, সীমা দে, অজিত ব্যানার্জী, জয়দেব সাহা, অনুপ নিয়োগী, দীপ্তা মজুমদার।

উত্তর কলকাতা

সংগঠক ঃ সনৎ ভট্টাচার্য্য

সহঃ সংগঠক ঃ সব্যসাচী চৌধুরী

প্রশিক্ষক ঃ ধীমান সাহা, গৌরাঙ্গ দেব দাস, সুশান্ত মন্ডল, ধীমান সাহা

সহায়ক ঃ পার্থ দাস, টিঙ্কু দাস

দক্ষিণ কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা

উপদেষ্টা ঃ শ্রীদাম সাহা

যুগ্ম সংগঠক ঃ রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, ভবানী মুখার্জী

সহঃ সংগঠক ঃ চন্দন শূর রায়, জয়দেব বারুই

প্রশিক্ষক ঃ সুজিত দে, আশীষ দাস, পঙ্কজ সরকার, অসীম দাস, স্বপন রায়, গোপাল ভৌমিক, সমর মন্ডল, হিমাংশু রায়, সুজিত পোদ্দার

সহায়ক ঃ অভিজিৎ দাস, অনিন্দিতা দাস, ভাস্বতী চ্যাটার্জী।

পূর্ব মধ্য কলকাতা

উপদেষ্টা ঃ সুখেন চক্রবর্ত্তী

সংগঠক ঃ অপরেশ মজুমদার

সহঃ সংগঠক ঃ অলোক মন্ডল

প্রশিক্ষক ঃ সত্যব্রত মুখার্জী

সহায়ক ঃ কৃষ্ণকান্ত নস্কর, শ্যামল রায়

উত্তর ২৪ পরগণা -১ (বারাসাত)

সংগঠক ঃ শুভেন্দু মুখার্জী

সহঃ সংগঠক ঃ তপন সাহা, জগদীশ দাস

প্রশিক্ষক ঃ সুচিন্ত্য সাহা, অজিত বড়ুয়া, সীমা দে, সন্তু বসু, প্রদীপ সাহা, প্রসূন মুখার্জী

সহায়ক ঃ গোপাল পাল, মানব পাল, গৌতম সরকার, চম্পা কুশারী

উত্তর ২৪ পরগণা -২ (বারাকপুর)

উপদেষ্টা ঃ শম্ভু ভট্টাচার্য, অরুন চক্রবর্ত্তী, দিলীপ চক্রবর্ত্তী

যুগ্ম সংগঠক ঃ ব্যোমকেশ ঘোষ, নৃপেন তালুকদার

প্রশিক্ষক ঃ মৃদুলা দেবনাথ

বসিরহাট

উপদেষ্টা ঃ নিমাই দে, ডাঃ মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

যুগ্ম সংগঠক ঃ সমীরণ মিত্র, অনিল মুখার্জী

প্রশিক্ষক ঃ সঞ্জীব দে, সুজাতা বিশ্বাস

সহায়ক ঃ তপন বিশ্বাস, রত্না ভদ্র

হাওড়া

উপদেষ্টা ঃ সজল চন্দ

সংগঠক ঃ পতিত পাবন দাস

সহঃ সংগঠক ঃ অমরাংশু দাস

প্রশিক্ষক ঃ সুদাম মহিন্দার, সুবীর গাঙ্গুলী, আখতারউল হোসেন জমাদার

হুগলী

উপদেষ্টা	ঃ	বীরেশ চক্রবর্ত্তী, কাজল রায়, তরুণ চক্রবর্ত্তী, প্রদীপ দাস
যুগ্ম সংগঠক	ঃ	ডঃ ফাল্গুনী গুপ্ত মজুমদার, শঙ্কর চক্রবর্ত্তী
সহঃ সংগঠক	ঃ	চন্দন দেবনাথ
প্রশিক্ষক	ঃ	মধুসূদন দাস, তারক মজুমদার, তরুণ চৌধুরী, কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, কমল সাহা, সুমনা চক্রবর্ত্তী, বিজন বড়ুয়া
সহায়ক	ঃ	অনুপ সরকার, শঙ্কর সেন, সঞ্জয় মণ্ডল, গদাধর চক্রবর্ত্তী, সুকোমল সাহা, তন্ময় বনিক, সৌরেন শর্মা, সুশান্ত মাইতি।

নদীয়া (দক্ষিণ)

উপদেষ্টা	ঃ	ভগীরথ সূত্রধর
সংগঠক	ঃ	অনুপকান্তি উকিল
সহঃ সংগঠক	ঃ	হরেকৃষ্ণ দে
প্রশিক্ষক	ঃ	গৌতম সূত্রধর, অমিতাভ ভট্টাচার্য্য

নদীয়া (উত্তর)

উপদেষ্টা	ঃ	মানস দাসগুপ্ত, তিমিরবরণ সরস্বতী
যুগ্ম সংগঠক	ঃ	ধীরাজ চ্যাটার্জী, বিকাশ প্রামানিক
সহঃ সংগঠক	ঃ	প্রভাস রায়
প্রশিক্ষক	ঃ	গণেশ মুখার্জী, দেবব্রত সরকার, সুমন্ত ঘোষ, অশোক দাস, দেবাশীষ সরকার
সহায়ক	ঃ	স্বপন নাথ, অতীন সরকার, সঞ্চিতা দাস

পূর্ব মেদিনীপুর

উপদেষ্টা	ঃ	পীযুষ চক্রবর্ত্তী
সংগঠক	ঃ	সুব্রত কর্মকার
সহঃ সংগঠক	ঃ	অর্ঘ্য মান্না
প্রশিক্ষক	ঃ	সুমিত্রা জানা
সহায়ক	ঃ	বাপী চক্রবর্ত্তী, রাজু সাহা, বীণা ঘড়া, শুভ্রা জানা

পশ্চিম মেদিনীপুর

উপদেষ্টা	ঃ	সুশান্ত দত্ত, নিকুঞ্জ বারিক
সংগঠক	ঃ	জীতেশ হোড়
সহঃ সংগঠক	ঃ	রতন সরখেল, অরূপকান্তি ব্যানার্জী
প্রশিক্ষক	ঃ	অজিত ব্যানার্জী, বর্ণালী ধর (সেন), অনুপম রায়, দীপঙ্কর দাস, বীশ্বেশ্বর বেরা
সহায়ক	ঃ	শেখ শাহাজাদা, মানবকান্তি দাস, বিমলকান্তি দুয়ারী, দিলীপ চাবড়ী

বাঁকুড়া - (১)

সংগঠক	ঃ	প্রণব বসু
সহঃ সংগঠক	ঃ	জয়দেব সাহা
প্রশিক্ষক	ঃ	ধনঞ্জয় মণ্ডল, মমতা চ্যাটার্জী

বাঁকুড়া - (২)

সংগঠক	ঃ	তপন গুপ্ত
প্রশিক্ষক	ঃ	নবীন সেনগুপ্ত, মণিশঙ্কর গুপ্ত, খয়রোজ মণ্ডল
সহায়ক	ঃ	প্রশান্ত মন্ডল, অতনু মন্ডল

বীরভূম

উপদেষ্টা	ঃ	অরুণ চৌধুরী
সংগঠক	ঃ	প্রশান্ত চ্যাটার্জী
সহঃ সংগঠক	ঃ	ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী
প্রশিক্ষক	ঃ	কালীকিঙ্কর দে, সুমঙ্গল সিংহ

জলপাইগুড়ি

উপদেষ্টা	ঃ	রতন ঘোষ
সংগঠক	ঃ	স্নেহাশীষ ঘোষ

দুর্গাপুর

উপদেষ্টা	ঃ	সিদ্ধেশ্বর শেঠ
সংগঠক	ঃ	নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য

সহঃ সংগঠক ঃ অজয় চক্রবর্ত্তী, দীপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী

প্রশিক্ষক ঃ দিলীপ শেঠ, দিলীপ ভট্টাচার্য্য, সুব্রত বিন্দু, অঞ্জন নাথ, শতাব্দী রায়

সহায়ক ঃ তন্ময় সিন্‌হা

আসানসোল

যুগ্ম সংগঠক ঃ অতুল বিশ্বাস, গোপাল গুহ

সহ সংগঠক ঃ স্বপন জমিদার

প্রশিক্ষক ঃ সৌগত রায়, বীণা পাল, সমীর ব্যানার্জী, পরিতোষ গুহ, রবিশঙ্কর পাল, অরুনাংশু বিশ্বাস, অশোক পাল, শোভা পাল, চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী

সহায়ক ঃ তাপস মুখার্জী

পুরুলিয়া

উপদেষ্টা ঃ চন্দন ঘোষ

সংগঠক ঃ অনুপ নিয়োগী

প্রশিক্ষক ঃ বিশ্বরূপ সিংহ মোদক

সহায়ক ঃ চঞ্চল রায় চৌধুরী, শ্রুতি ঘোষ, শিশির সিংহ মোদক

মুর্শিদাবাদ

উপদেষ্টা ঃ স্বপন ঘোষ, জনার্দন ঘোষ

সংগঠক ঃ মহামায়া ঘোষ

সহঃ সংগঠক ঃ নবকুমার বোস, রামকৃষ্ণ ঘোষ, কুমুদ চক্রবর্তী

প্রশিক্ষক ঃ দিলীপ দাস, শাশ্বতী ঘোষ, নারায়ণ সাহা

মালদা

উপদেষ্টা ঃ নৃপেন্দ্র লাল সাহা

সংগঠক ঃ বরুণ দাশগুপ্ত, অশেষ রায়

সহঃ সংগঠক ঃ মানস রায়

সহায়ক ঃ মনোজ ভট্টাচার্য্য

কোচবিহার

সংগঠক ঃ অজিত বর্মন

প্রশিক্ষক ঃ পার্থ সারথী চ্যাটার্জী

দার্জিলিং

সংগঠক ঃ সুবোধ ঘোষ

বার্ষিক শিক্ষা শিবির পঞ্জী

১৯৫৫	দেওঘর / বিহার
১৯৫৬	মুর্শিদাবাদ / পশ্চিমবঙ্গ
১৯৫৭	কামটার / বিহার
১৯৫৮	রাঁচী / বিহার
১৯৫৯	মধুপুর / বিহার
১৯৬০	ভুবেনশ্বর / ওড়িশা
১৯৬১	বালেশ্বর / ওড়িশা
১৯৬২	রাউরকেল্লা / ওড়িশা
১৯৬৩	ঝাড়গ্রাম / পশ্চিমবঙ্গ
১৯৬৪	সিউড়ি / বীরভূম
১৯৬৫	বিষ্ণুপুর / বাঁকুড়া
১৯৬৬	চিত্তরঞ্জন / বর্ধমান
১৯৬৭	ভুবনেশ্বর / ওড়িশা
১৯৬৮	বার্ণপুর / বর্ধমান
১৯৬৯	বহরমপুর / মুর্শিদাবাদ
১৯৭০	হরিশচন্দ্রপুর / মালদহ
১৯৭১	বারানসী / উঃ প্রদেশ
১৯৭২	দিল্লী
১৯৭৩	রায়গঞ্জ / পঃ দিনাজপুর
১৯৭৪	মাইথন / বিহার
১৯৭৫	কোচবিহার / পশ্চিমবঙ্গ
১৯৭৬	নলহাটী / বীরভূম
১৯৭৭	আলিপুরদুয়ার / জলপাইগুড়ি
১৯৭৮	কাঁথি / মেদিনীপুর
১৯৭৯	শিলিগুড়ি / দার্জিলিং
১৯৮০	মুরাডি / পুরুলিয়া
১৯৮১	আহমেদপুর / বীরভূম
১৯৮২	বার্ণপুর / বর্ধমান
১৯৮৩	বসিরহাট / উত্তর ২৪ পরগণা
১৯৮৪	হুগলীহাট / হুগলী
১৯৮৫	সিউড়ি / বীরভূম
১৯৮৬	মাহদহ / পশ্চিমবঙ্গ
১৯৮৭	টাটানগর / বিহার
১৯৮৮	খড়্গপুর / মেদিনীপুর
১৯৮৯	দুর্গাপুর / বর্ধমান
১৯৯০	সাঁইথিয়া / বীরভূম
১৯৯১	আসানসোল / বর্ধমান
১৯৯৩	বেহালা / কলকাতা
১৯৯৪	বারাসাত / উঃ ২৪ পরগণা
১৯৯৬	বহরমপুর / মুর্শিদাবাদ
১৯৯৭	আহমেদপুর / বীরভূম
১৯৯৮	অশোকনগর / উঃ ২৪ পরগণা
১৯৯৯	দত্তপুলিয়া / নদীয়া উঃ
২০০০	দক্ষিণ রসুলপুর / হুগলী
২০০১	আসানসোল / বর্ধমান
২০০২	নবব্যারাকপুর / উঃ ২৪ পরগণা
২০০৩	মালদা / পশ্চিমবঙ্গ
২০০৪	বড়জোড়া / বাঁকুড়া

১৯৯২ এ দেশে অস্বাভাবিক অবস্থা ও ১৯৯৫ সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি উৎসবের জন্য শিবির হয়নি।

কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির (দ্বিবার্ষিক)

১৯৭২	দুর্গাপুর / বর্ধমান
১৯৭৩	মেদিনীপুর / পশ্চিমবঙ্গ
১৯৭৪	পুরুলিয়া / পশ্চিমবঙ্গ
১৯৭৫	আসানসোল / বর্ধমান
১৯৭৬	আরামবাগ / হুগলী
১৯৭৭	কৃষ্ণনগর / নদীয়া
১৯৭৮	দুর্গাপুর / বর্ধমান
১৯৭৯	সারাঙ্গাবাদ / দঃ ২৪ পরগণা
১৯৮১	বাঁকুড়া / পশ্চিমবঙ্গ
১৯৮২	বহরমপুর / মুর্শিদাবাদ
১৯৮৩	লাভপুর / বীরভূম
১৯৮৫	শক্তিনগর / নদীয়া
১৯৮৭	বর্ধমান / পশ্চিমবঙ্গ
১৯৮৯	চাকদহ / নদীয়া
১৯৯৩	লিলুয়া / হাওড়া
১৯৯৫	তাহেরপুর / নদীয়া
১৯৯৭	তেহট্ট / নদীয়া
১৯৯৯	হরিশচন্দ্রপুর / মালদহ
২০০১	মেদিনীপুর / পশ্চিমবঙ্গ
২০০৩	শিবির হয়নি

শাখা আসর দেশ বিদেশে

সবপেয়েছির আসর মূলকেন্দ্র ও অঞ্চলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ আছে সক্রিয় এমন শাখা আসরের নাম এবারের তালিকায় ছাপা হল। এর বাইরে ও বহু শাখা আসর সবপেয়েছির আদর্শ ও লক্ষ্য অনুসরণ করে শিশু কল্যাণে নিয়োজিত আছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন শাখা বিন্যাসে অনিচ্ছাকৃত বিচ্যুতি থাকলে সম্পাদনা ও সংগঠন বিভাগ ক্ষমাপ্রার্থী।

উত্তর কলকাতা

নবমিতালি - দেশবন্ধু পার্ক
মুরারীপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ - মুরারী পুকুর
অগ্নিশিখা - মুরারীপুকুর
গোপীমোহন - শ্যামপার্ক
কুমারটুলি - কুমারটুলি
মুকুল - টালাপার্ক
নবদিগন্ত - বীরপাড়া/দমদম
সিঁথি মিলন সংঘ - সিঁথি
নিবেদিতা - বাগবাজার
ইন্টালী মর্ণিং এ্যাথঃ ক্লাব- ইন্টালী

পূর্বমধ্য কলকাতা

রাজারহাট - রাজারহাট
চাঁদপুর মিলন সংঘ - রাজারহাট
ভারতমিলন - কাঁকুরগাছি
বেলেঘাটা কল্যাণ সংঘ - বেলেঘাটা
স্বপ্নদীপ - বেলেঘাটা
তরুণদল - কাঁকুরগাছি
শ্রমপল্লী - বেলেঘাটা
শিখরপুর সুকান্ত - শিখরপুর
শিশু সংগম - লেবুতলা পার্ক
অগ্রণীচক্র - ফুলবাগান
অগ্রণী - বেলেঘাটা
সবুজপল্লী - গৌরাঙ্গনগর
চক্‌পাঁচুড়িয়া শিশুসাথী - চক পাঁচুড়িয়া
কদমপুর শিশু সংগম - কদমপুর

দক্ষিণ কলকাতা

গার্ডেনরীচ - গার্ডেনরীচ
চেতলা - আলিপুর
রক্তকরবী - যাদবপুর, সন্তোষপুর
ক্ষুদিরাম - ঠাকুরপুকুর
টালিগঞ্জ - টালিগঞ্জ
ফ্রেন্ডস্ ইলেভেন - পূর্বপুটিয়ারী
প্রগতি সংঘ - লেক গার্ডেনস
সতীন সেন স্মৃতি সংঘ - সরশুনা
শিশুভারতী - সরশুনা
আমরা সকল প্রগতি বাহিনী - সরশুনা
বাঘাযতীন - বাঘাযতীন
দিশারী - আদর্শপল্লী, বেহালা
বেহালা সবুজপাতা - বেহালা
বড়িষা জনকল্যাণ (বালিকা) বিদ্যাপীঠ - বড়িষা
শিশির বিন্দু - চড়কতলা
সাহাপুর নবারুণ সংঘ - নিউ আলিপুর
বেহালা বোধয়ন - সরশুনা
পূজারিনী - ঢাকুরিয়া
আলোক দিশারী - বেহালা
ঐক্যাতানিক -
শিশুশিল্পী -
নবীন সংঘ -
শিশুভবন -

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সারাঙ্গাবাদ - সারাঙ্গাবাদ
পাঠ্যনিকেতন - ফলতা
সন্ধ্যাতারা - নবাসন
আকড়া নবারুণ - আকড়া
ডায়মন্ড - ডায়মন্ড হারবার
সোনার বাংলা - সহরার হাট
সুকান্ত মেলা - সন্তোষপুর
উদীয়মান - বজবজ
সন্দীপন - বজবজ
স্বামী বিবেকানন্দ -

উত্তর ২৪ পরগণা (ব্যারাকপুর)

পুবালি - বেলঘরিয়া
নেতাজি শিশু উদ্যান - বেলঘরিয়া
ডাঃ প্রশান্ত রায় স্মৃতি - বেলঘরিয়া
নবারুণ শিশুমিলন - সোদপুর
বরুণ স্পোর্টিং - পাণিহাটি
শ্যামনগর - শ্যামনগর
কল্পতরু - ব্যারাকপুর
নবোদয় - নৈহাটি
আনন্দমঠ - ইছাপুর
কবি রবীন্দ্র - কাঁচড়াপাড়া
সপ্তর্ষি - হালিশহর
ঈশ্বরগুপ্ত - কাঁচরাপাড়া
ছোটদের মহল -
চক্ কাঠালিয়া সবুজ সংঘ-

উত্তর ২৪ পরগণা (বারাসত)

মানবতা - হৃদয়পুর
রাখালরায় স্মৃতি - হৃদয়পুর
রক্তরবি - অশোকনগর
আগুয়ান সংঘ - পূর্ব কালিকাপুর
উদয়রাজপুর বিবেকানন্দ - মধ্যমগ্রাম
উত্তরপূর্ব ন'পাড়া সৃজনী - বারাসত
চলন্তিকা - নব ব্যারাকপুর
সতীন সেন পল্লী - বারাসত
সাহারা সবুজসাথী - মধ্যমগ্রাম
নবাকাঙ্খী - নব ব্যারাকপুর

বর্ণালী - দোলতলা
কিশলয় - নব ব্যারাকপুর
বারাসত অভিযান - বারাসাত
সবুজ সরণী -
উত্তর-পূর্ব ন'পাড়া সৃজনী -
যতীন্দ্রনাথ শিশুবিতান -
নবরঙ্গ -
যদুনাথবাটি -

নদীয়া (দক্ষিণ)

সন্ধানী - চাকদহ
মদনপুর - মদনপুর
চাকদহ স্বামীজী - চাকদহ
শিশু মিলনী - কল্যাণী
মঞ্জুরী - চাকদহ
চাকদহ কিশলয় - চাকদহ
শিমুরালী নিবেদিতা - শিমুরালী
কল্যাণী আসর - কল্যাণী
কাটাগঞ্জ -

নদীয়া (উত্তর)

রাণাঘাট - রাণাঘাট
বগুলা - বগুলা
রেলওয়ে রিক্রিয়েশন - রাণাঘাট
ইউনাইটেড ক্লাব - রাণাঘাট
মৈত্রী - রাণাঘাট
রাণাঘাট মিলনমন্দির - রাণাঘাট
নূতনগ্রাম - হিজুলী
বৈশাখী অনিক - হিজুলী
ছাত্রসংঘ - তাহেরপুর
আড়ংঘাটা - আড়ংঘাটা
রাঘবপুর - হবিবপুর
অজয় স্মৃতি - কৃষ্ণগঞ্জ
সরস্বতী সমিতি - রাণাঘাট
তরঙ্গ - চাঁদেরঘাট
অনির্বাণ - রাণাঘাট
মৈত্রেয়ী - বেথুয়াডহরী
কালীনারায়ণপুর সুহৃদ সংঘ - কালীনারায়ণপুর
কৃষ্ণনগর কচিপাতা - কৃষ্ণনগর
পরশমণি - শিবপুর
দেবগ্রাম - দেবগ্রাম
গোবরাপোতা অঙ্কুর - গোবরাপোতা, কৃষ্ণনগর
শক্তিনগর - কৃষ্ণনগর
তরুণিমা - দত্তপুলিয়া
বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউট অব কালচার - রাণাঘাট
কৃষ্ণনগর রেলওয়ে রিক্রিয়েশন - কৃষ্ণনগর
নবরূপা - কালীরহাট
আদর্শ - রাণাঘাট
প্রীতিনগর - পায়রাডাঙ্গা
কিত্তিনগর - রাণাঘাট
কিঞ্জল - তেহট্ট
সর্বশ্রী সংঘ - বাদকুল্লা
নূতন শিবপুর - নূতন শিবপুর
দিশা -
পাণিখালি শিশুসাথী -
শিল্পী সংঘ -
নবরঙ্গ -
শিশুমিলন -
হাটখোলা হাই মাদ্রাসা -
রামমোহন -

হাওড়া

বাঘাযতীন স্মৃতি সংঘ - রামচন্দ্রপুর
শিবপুর বি.ই. কলেজ উদয়ন - শিবপুর
মধুমিতালী - চ্যাটার্জিহাট
মানিকপুর - মানিকপুর
অমর সংঘ - সাঁকরাইল
গল্পস্বল্প - বেলুড়
রামকৃষ্ণপুর ব্যায়াম সমিতি - রামকৃষ্ণপুর
বালী শিশুসাথী - বালী
কিশোর কল্যাণ সংঘ - বাক্সাড়া
লিলুয়া সবুজ সংঘ - লিলুয়া
নবোদয় উলুবেড়িয়া - উলুবেড়িয়া
আমড়িয়া - কোলড়া
শুভা - ধর্মতলা
বনান্ত - আন্দুল রোড
জাগরণী (নাসারী কিন্ডার গার্ডেন) - বাকসাড়া
দক্ষিণ মাজু আমরা সবাই - মাজু
নেতাজী সংঘ - পাঁচলা
সূর্যনগর মৈত্রীসংঘ - সূর্যনগর
অগ্নিবীণা শিশু -

হুগলী

বলাকা শিশু সংসদ - রিষড়া
মনিমুক্তা - কৈকালা
শুকতারা - মাহেশ
ভ্রাতৃ সংঘ - মাহেশ
অগ্রদূত ব্যায়াম সমিতি - রিষড়া
জঙ্গলপাড়া - জঙ্গলপাড়া
তালপুর তরুণ সংঘ - তালপুর
নবারুণ - মাহেশ
চাঁপাডাঙা শক্তি সংঘ - চাঁপাডাঙা
ইলছোবা - পান্ডুয়া
অর্জুন - রিষড়া
রিষড়া - রিষড়া
আশা - হিন্দমোটর
জনাই চৈতালী - জনাই
সঞ্চিতা - ভদ্রেশ্বর
পূর্বাশা - শ্রীরামপুর
জঙ্গলপাড়া অগ্নিবীণা - চাঁপাডাঙ্গা
অরবিন্দ পল্লী - কোন্নগর
খন্যান বিবেকানন্দ - পান্ডুয়া
দীপশিখা - জনাই
নেতাজী সুভাষ - রসুলপুর
এগিয়ে চলো - ভদ্রেশ্বর
ইটাচুনা - পান্ডুয়া

ত্র্যম্বক - তারকেশ্বর
দীপ্তি - শ্রীরামপুর
ব্লু-ষ্টার - বৈঁচী
আলোকদূত - ব্যান্ডল
রিষড়া বৌদ্ধ যুবসংঘ - রিষড়া
উত্তরণ - রিষড়া
খন্যান নেতাজী - খন্যান
নবপল্লী মেঘদূত সংঘ - কানাইপুর
সত্যভারতী - নবগ্রাম
উত্তর নৈটি - নৈটি
রত্নদীপ - মালিপাড়া
সোপান - কোন্নগর
মিতালী সমাজ - আরামবাগ
হরিপাল কালচারাল - খামার চন্ডী
মহেশ নবারুণ -
রবীন্দ্র নজরুল -
জনাই নিবেদিতা -

দুর্গাপুর

পুরোদীপ - জামালপুর
অমৃতের - দুর্গাপুর স্কুলরোড
দুর্গাপুর মালঞ্চ -ডি. টি. পি. এস
সুকান্ত স্মৃতি - তেঁতুলতলা
দুর্বার - রহিমপুর
শিশুসাথী অঙ্গন - বিধাননগর হাউসিং
সবুজপ্রাণ - রাতুতিয়া
অজানা - কনিষ্ক রোড
পূর্বাভাষ - ধান্ডাবাগ
ভিরিঙ্গী শিশুসাধী - ভিরিঙ্গী
শ্যামলিমা - আর. ই. কলেজ
অনুপমা - অশোক এভিনিউ
রাণার - ধান্ডাবাগ
উদয়নগর - আমরাই
ধূনারা উদয়ন - বেনাচিতি
মণিদীপা - দয়ানন্দ রোড
দুর্গাপুর মিলনপল্লী -
সবুজনগর -
ধূনারা -

বাঁকুড়া (১)

দীপাবলী - বড়জোড়া
পল্লীসাথী - ঘটুগোড়িয়া
মেজিয়া কোরক - মেজিয়া
শাশ্বত - প্রতাপপুর বড়জোড়া

বাঁকুড়া (২)

গোপালপুর আমরা ক'জন - পলাশডাঙ্গা
সবুজমিলন - রাধামোহনপুর
সিমলা ছাত্র সংঘ - বীরসিংহপুর
সবুজ মঞ্জরী - রাধামোহনপুর
আনন্দমেলা - হাট আশুড়িয়া
নেতাজী সবুজ মেলা - পিয়ারবেড়
সেবক সংঘ - আলমপুর
বনদুবরাজপুর শিশুতীর্থ -
স্বপ্নের শিখর -
নবমঞ্জরী -

বীরভূম

দেবদূত - সুপুর
সাঁইথিয়া - সাঁইথিয়া
কবি সুকান্ত - আহমদপুর
মহম্মদ বাজার - মহম্মদ বাজার
গুসকরা স্ফুলিঙ্গ - গুসকরা
বেলাড়ী যজ্ঞেশ্বর শিশুচেতনা বিকাশ - বেলাড়ী
অজয় - শীর্ষা, জয়দেব
গুসকরা সুকান্ত - গুসকরা
তারাশংকর - লাভপুর
ব্রহ্মানন্দ - বোলপুর
উদয়ন - মাহাতা
গুসকরা কোরক - বর্ধমান
দন্তকেশ্বর - দাঁড়কা
চন্দীদাস -
রাঙ্গামাটি -
গীতাঞ্জলি -
নবরাগ -
সিউর পল্লীমঙ্গল -
গুসকরা নেতাজী পল্লী -

আসানসোল

দীপান্বিতা - সুভাষপল্লী, বার্ণপুর
দিঘারী - নিউটাউন, বার্ণপুর
শিশুপ্রাঙ্গণ - প্রান্তিক, বার্ণপুর
রেলকলোনী কল্পতরু - রেলকলোনী, বার্ণপুর
ঐকতান - নিউ আপার চেলিডাঙ্গা
স্বরাজ - সন্ন্যাসীতলা, কুলটি
নিঙ্গাবহ্নিশিখা - নিঙ্গা
মহিশীলা সোনালি - মহিশীলা কলোনী
সোনালী শিবির - ৩নং মহিশীলা কলোনী
আসানসোল গ্রাম - আসানসোল
বিধানপল্লী - বিধানপল্লী
সিদুলী - সিদুলী
শায়ক - বগুলা
মহিশীলা কিশলয় - মহিশীলা
নবঘন্টি পূর্বাচল - নবঘন্টি
বৈশাখী - চুচুরিয়া রোড

পূর্ব মেদিনীপুর

প্রদীপ্ত শিখা - পুরাতন বাজার
রঞ্জিত স্মৃতি - নিউ ডেভেলপমেন্ট
মালঞ্চ নেতাজী - মালঞ্চ
কিশোর মিলন - তালবাগিচা
খড়গপুর মিতালী সংঘ - নিমপুরা
কিশোর জগৎ - বল্লুকহাট
সবুজ শিক্ষানিকেতন - চিত্র
তমলুক শিশু বিতান - পদুমবসান
আশার প্রদীপ - পদুমবসান
দুর্গাচক - দুর্গাচক
হলদিয়া ফ্রেন্ডস ক্লাব - হলদিয়া
বাসুদেবপুর সবুজসাথী - বাসুদেবপুর

সমাজ উন্নয়ন পরিষদ - রঘুরামপুর
বেদালোক - আশদতলা
চৈতন্যপুর যুগের যাত্রী - চৈতন্যপুর
মিলন শিশুতীর্থ -

পশ্চিম মেদিনীপুর

শকুনডিহা স্বামীজী - আনন্দপুর
বঙ্কিমস্মৃতি - মেদিনীপুর
সৈনিক - কুইকোটা
রবীন্দ্রনগর - রবীন্দ্রনগর
বিদ্রোহী সংঘ - আবাস
বঙ্গশ্রী - হবিবপুর
ঘাটাল - ঘাটাল
রামকৃষ্ণনগর - রামকৃষ্ণনগর
শিশুকথা - সিপাইবাজার
আসনাশুলি নবীন সংঘ - সৈয়দপুর
আনন্দপুর - কেশপুর
নজরুল স্মৃতি -
শহীদ ক্ষুদিরাম -

পুরুলিয়া

বরাবাজার তরুণসংঘ - বরাভূম
অরুণোদয় - মুরাডি
বরাবাজার সবুজ সংঘ - বরাবাজার
স্টার ক্লাব - মুনসেফডাঙ্গা
পারিজাত - গড়জয়পুর
নিগমানন্দ - আড়রা
পুরুলিয়া শিশু মেলা - রাঁচী রোড
শক্তি সংঘ - চকবাজার
দেশবন্ধু যোগাসন - দেশবন্ধু রোড
ফাল্গুনী - রাঙ্গাডি
বনফুল ক্লাব - সিরকাবাদ
দেওখরিয়াডি আদিবাসী সংঘ -
প্রাপ্তি -
নডিহা প্রান্তিক -

আসানসোল

কবি নজরুল - শ্রীপুর কোলিয়ারী
অভ্যুদয় গোষ্ঠী - বড়বাজার, রাণীগঞ্জ
সুহৃৎ - সাহেববাঁধ পাড়া
সব্যসাচী - পনিয়াটি ওয়ার্কশপ
সৌভাস্মৃতি - বক্তারনগর
কালোহীরা - শিবপুর
বাসন্তিকা - ইন্দ্রা
রাজপুরনন্তী - রাজপুরনন্তী
রাণীগঞ্জ - রাণীগঞ্জ

বসিরহাট

বসিরহাট সবুজ - টাকি রোড
বসিরহাট প্রান্তিক - কলেজপাড়া
বসিরহাট ভারতী - সাইপালা
কচিকাঞ্চন - বাদুরিয়া
খেলাঘর - আঁধারমানিক
সুন্দরবনাঞ্চল ত্রিধারা - হিঙ্গলগঞ্জ
শুকপুকুড়িয়া তরুণ সংঘ - আলবেলিয়া
নদীভাগ পরশমণি - বাদু
নবীনা - ইটিন্ডা
পাইকপাড়া আনন্দমেলা - পাইকপাড়া
ভেবিয়া সবুজসাথী - ভেবিয়া
হরিশপুর সারদা - হরিশপুর

কোচবিহার

তুফানগঞ্জ সূর্যোদয় - তুফানগঞ্জ
নবপ্রগতি সংঘ - বালাকান্দী
মাথাভাঙ্গা আনন্দমেলা - মাথাভাঙ্গা
বি.আর.সি.শতদল - ভাংগী
সীমান্ত - গীতালদহ
গোসানীমারী সবুজসাথী - গোসানীমারী

জলপাইগুড়ি

প্রান্তিক - আলিপুরদুয়ার কোর্ট
অপরাজিতা - কামাখ্যাগুড়ি
শ্রীঅরবিন্দ শিশুমেলা - আলিপুরদুয়ার কোর্ট
পল্লীমঙ্গল মৌটুসি - আলিপুরদুয়ার
মিলনমেলা - আলিপুরদুয়ার
জনকল্যাণ - আলিপুরদুয়ার জং
সপ্তক - আদরপাড়া
কল্পতরু - আলিপুরদুয়ার
নবোদয় - খাগড়া
নবমুকুল - তপসীখাতা
বারবিশা সমাজ কল্যাণ - বারবিশা
স্পোর্টিং - পাচকোলগুড়ি
ভাটিবাড়ি ঐকতান - ভাটিভাড়ি
ময়রাডাঙ্গা গোপ্পু মেমোরিয়াল - ফালাকাটা
ফালাকাটা - ফালাকাটা
রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন -
যাদবপল্লী উচ্চ বিদ্যালয় -
বিরশা বিদ্যাভবন -
শিলবাড়ীহাট উচ্চ বিদ্যালয় -
ফালাকাটা উচ্চ বিদ্যালয় -
সোনারায়ের ধাম -
সুকান্ত -
শিশুবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় -
বেলতলী -
যুবসংঘ -
বাদাইটারী উজিড়িয়া হাই মাদ্রাসা -

মালদহ

সূর্যিমামা - পশ্চিম হায়দাবপুর
বনবাণী - হরিশচন্দ্রপুর
বৈতালিক - গভঃ কলোনী
মণিমঞ্জুসা - সুভাষপল্লী
হুল্লোড় - বুলবুলচন্ডী
মালদহ শিশুমেলা - গ্রীণপার্ক

গৌড়বঙ্গ - রাজমহল রোড
কুমোদপুর - তালগ্রামহাট

মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর - বহরমপুর
সত্যসেবা - জিয়াগঞ্জ
মহলন্দী - মহলন্দী
গাঁতলা নতুন কুড়ি - গাঁতলা
জেমো সর্বোদয় - কান্দী
অগ্নিবীণা - সাগরদীঘি
অরবিন্দ ক্লাব - ইসলামপুর
পালপাড়া - পালপাড়া
নওপাড়া নবমঞ্জুরী - সাগরদীঘি
আশার আলো - বহরমপুর
সাগরপাড়া - সাগরপাড়া
শেখপাড়া - শেখপাড়া
রামনগর শিশু মঙ্গল - রাণীনগর
বাইশভাই - ইসলামপুর
ঝর্ণাধারা - কান্দী
পুরন্দরপুর - পুরন্দরপুর
ভগবতী স্মৃতি - উগ্র ভাটপাড়া
নবমঞ্জুরী - উগ্র ভাটপাড়া
গোকর্ণ আনন্দশিবির - গোকর্ণ
অনীক - মহলন্দী কলোনী
লালগোলা শৈলজা মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল - লালগোলা
শিবাজী সংঘ - বানজেটিয়া
বলরামপুর শিশু মিলনী - বলরামপুর
তরুণ সংঘ - ঘনশ্যামপুর
বিবেকানন্দ - জিয়াগঞ্জ
রর্সোরা তরুণ সংঘ - রর্সোরা
সাগরদীঘি ন'পাড়া - সাগরদীঘি
রুদ্রবাটী কিশলয় - রুদ্রবাটী
আলোর সাথী - কান্দী
হরিদাসমাটি শিশুকল্যাণ - হরিদাসমাটি
নিলীমা দেবী স্মৃতি সংঘ -
ভোরের আলো -

দার্জিলিং

শিলিগুড়ি উদয়ন - শিলিগুড়ি
পানু দত্ত মজুমদার স্মৃতি - শিলিগুড়ি
খড়িবাড়ি - খনিবাড়ি
বাগডোগরা ওয়াই.এম.এস. - বাগডোগরা
রামমোহন - উঃ বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বহিঃ বঙ্গ

মাইথন ক্লাব - মাইথন
পথিকৃৎ - ধানবাদ
কালোমাটি - টাটা
নবটোলা - টাটানগর
বাদমা - জামসেদপুর
প্রমথনগর যুবক সংঘ - জামসেদপুর
তপন স্মৃতি - জামসেদপুর

উত্তর প্রদেশ

জয়যাত্রা - বারানসী
অন্বেষ - মোগলসরাই

মধ্যপ্রদেশ

নবকিশলয় - জব্বলপুর
অনিন্দিতা - বিলাসপুর

অসম

ঝিলমি - কাছাড়

ওড়িষা

বঙ্গভারতী - বান্ডামুন্ডা
বিশ্বভারতী - বান্ডামুন্ডা

ধীর ব্যায়াম

প্রস্তুত অবস্থা ঃ **সোজা বাবু হয়ে বসতে হবে এবং দু'হাত পাশে ছড়ানো থাকবে। হাতের আঙ্গুলের মাথাগুলো জমির সঙ্গে লাগানো থাকবে।**

প্রথম ভঙ্গী ঃ ১) দু'হাত দু'পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে মাথার উপরে উঠবে। হাত জোড়া ও টান থাকবে।

২) দু'হাতের কনুই ভেঙে মাথার উপর নমস্কার করার ভঙ্গী।

৩) দু'হাত উপরে সোজা ও টান থাকবে (১-এর মতো)।

৪) আস্তে আস্তে হাত দু'পাশ দিয়ে নামিয়ে প্রস্তুত অবস্থায় আসতে হবে। ৫-৮ পর্যন্ত একইভাবে হবে। (আদেশ ধীরে হবে।)

২ নং ব্যায়াম ঃ ১) বাঁ-হাত সামনে দিয়ে এনে ভেঙে বুকে। হাতের চেটো নীচের দিকে।

২) ১-এর মতো ডান হাত বুকের কাছে আনতে হবে।

৩) দু-হাত এক সঙ্গে সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে পাশে আনতে হবে এবং হাত জমির সঙ্গে সমান্তরাল থাকবে।

৪) হাত নামিয়ে প্রস্তুত অবস্থায় আনতে হবে। (আদেশ ধীরে হবে।)

তৃতীয় ভঙ্গী ঃ ১-২-৩ সংখ্যা মাটিতে এবং ৪ সংখ্যা মাথার উপরে তালি দিতে হবে (দৃষ্টি উপরে)। এইভাবে ৫-৬-৭ মাটিতে এবং ৮ মাথার উপরে তালি হবে। শেষে ১৬তে উপরে তালির পর মুখে 'আপ' বলে প্রস্তুত অবস্থায় আসতে হবে। (আদেশ দ্রুত হবে)

চতুর্থ ভঙ্গী ঃ ১) দু'হাত পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে মাথার উপরে। হাতের চেটো মাথার তালুতে লাগানো থাকবে।

২) আস্তে আস্তে কোমর ভেঙে ১-এর অবস্থায় কপাল মাটিতে ঠেকাতে হবে।

৩) ধীরে আদেশের সঙ্গে সোজা হয়ে ১-এর অবস্থায় আসতে হবে।

৪) হাত আস্তে আস্তে উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে প্রস্তুত অবস্থায় আসতে হবে। (আদেশ ধীরে হবে।)

পঞ্চম ভঙ্গী ঃ ১-২ মাটিতে এবং ৩-৪ মাথার উপরে তালি দিতে হবে (দৃষ্টি উপরে)। একইভাবে ১৬ পর্যন্ত হবে। শেষে ১৬তে উপরে তালি দিয়ে 'আপ' বলে প্রস্তুত অবস্থায় আসতে হবে। (আদেশ দ্রুত হবে।)

ষষ্ঠ ভঙ্গী ঃ (শুভম্, স-পে-আ)

১) 'শুভম্' বললে হাত পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে মাথার উপরে উঠবে। উপরে হাত জোড়া ও টান থাকবে।

২) 'স'-বললে ১-এর অবস্থায় আস্তে আস্তে কোমর ভেঙে কপাল মাটিতে ঠেকাতে হবে এবং হাত জোড়া অবস্থায় সামনের দিকে ছড়ানো থাকবে।

৩) 'পে' বললে পুনরায় আস্তে আস্তে ১-এর অবস্থায় ফিরে আসতে হবে।

৪) 'আ'-বললে দু'হাত ঘুরিয়ে পাশ দিয়ে প্রস্তুত অবস্থায় আসতে হবে। (আদেশ ধীরে হবে।)

তালি ব্যায়াম

তালি ব্যায়ামে তালির আওয়াজ জোরে করতে হবে, তবেই তালি ব্যায়ামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হবে।

ব্যায়ামের ভঙ্গীর বিবরণ ঃ—

১ নং ব্যায়াম ঃ ১) দু'হাত ভেঙে বুকের কাছে নমস্কারের ভঙ্গিতে তালি দাও। শরীর সোজা থাকবে।

২) দু'হাত উপর দিয়ে খুলে সামনে নীচে নিয়ে গিয়ে তালি দাও। এইভাবে ১৬ সংখ্যা পর্যন্ত তালি দিয়ে ব্যায়ামটি করতে হবে।

২ নং ব্যায়াম ঃ ১) দুহাত ভেঙে বুকের কাছে তালি দাও।

২) দু'হাত মাথার উপরে নিয়ে তালি দাও। এইভাবে ১৬ সংখ্যা পর্যন্ত তালি দিয়ে ব্যায়ামটি করতে হবে।

৩ নং ব্যায়াম ঃ ১) দু'হাত ভেঙে বুকের কাছে (হাত থুতনির ঠিক নীচে থাকবে) তালি।

২) দু'হাত খুলে পিছনে নিয়ে গিয়ে তালি দাও। এইভাবে ১৬ সংখ্যা পর্যন্ত তালি দিয়ে ব্যায়ামটি করতে হবে।

৪ নং ব্যায়াম ঃ ১) বাঁ পা বাঁপাশে নাও এবং দুহাত ভেঙে বুকের কাছে তালি দাও।

২) মাথার উপরে তালি দাও।

৩) বুকের মাঝে নিয়ে তালি দাও।

৪) বাঁ পা ডান পায়ের সাথে জোড়া করে এবং দু'হাত খুলে দু'পাশের জানুতে তালি দাও। ৫ নং থেকে ৮ নং ডান পা ডান পাশে নিয়ে পূর্ব্বৎ হবে।

৯ নং থেকে ১৬ নং সংখ্যা পূর্ববৎ বাঁ পাশে ও ডান পাশে পা নিয়ে তালি দিয়ে ব্যায়াম করতে হবে।

৫ নং ব্যায়াম ঃ ১) বাঁ-পা সামনে বাড়াও ও বুকের মাঝে তালি দাও।

২) কোমর ভেঙে নীচু হয়ে বাঁ পায়ের নীচে তালি দাও।

৩) শরীর সোজা করে বুকের মাঝে তালি দাও।

৪) বাঁ পা টেনে ডান পায়ের সাথে জোড়া কর ও দু'হাত দু'পাশের জানুতে তালি দাও।

৫ নং থেকে ৮নং পূর্ব্ববৎ ডান পা এগিয়ে তালি ব্যায়াম করতে হবে। ৯ নং থেকে ১৬ নং সংখ্যা পূর্ব্বৎ বাঁ পা ও ডান পায়ে হবে।

৬ নং ব্যায়াম ঃ হাঁটু ভেঙে গোড়ালি তুলে ২ পায়ের পাতায় ভর দিয়ে এবং সামনের দৃষ্টি রেখে বসতে হবে এবং এই অবস্থায় ২ হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে গোড়ালির ঠিক উপরে রেখে ছোট ছোট লাফ দিয়ে দিয়ে ১৬ তালে ১৬ বার তালি দিতে হবে।

৭ নং ব্যায়াম ঃ ১) ৬ নং ব্যায়ামের শরীরের অবস্থান থেকে লাফিয়ে শরীর সোজা করে পা ফাঁক কর ও মাথা উপরে তালি দিতে হবে।

২) লাফিয়ে পা জোড়া কর ও দু'হাত নামিয়ে দু'পাশের জানুতে চাপড়িয়ে তালি দাও। এইভাবে ১৬ তালে করতে হবে।

৮ নং ব্যায়াম ঃ ১-২ বাঁহাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে ২ বার তালি দাও।

৩-৪ বাঁ হাত ঘুরিয়ে চেটোতে ডান হাত দিয়ে তালি দাও।

৫-৬ ১ এর মত তালুতে ২ বার তালি দাও।

৭-৮ দু'পাশে জানুতে দু'বার চাপড়িয়ে তালি।

আরেকবার ঐভাবে ৮ তালি দিতে হবে।

বারো মাসে তেরো পার্বন

গত দুবছরে মূলকেন্দ্রের পরিচালনায় সংগঠিত আসর সন্দেশে প্রকাশিত সংবাদ

মালদায় ৪৭ তম বার্ষিক শিবির

মহাসমারোহে সবপেয়েছির আসরের ৪৭ তম বার্ষিক সর্বভারতীয় শিবির অনুষ্ঠিত হয় ২৫-৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ মালদার ডি. এস. এ. স্টেডিয়ামে, মালদা অঞ্চলের সুন্দর ব্যবস্থাপনায়। প্রায় এক হাজার শিবির শিক্ষার্থী সোনারকাঠি, কর্মী, কেন্দ্রীয় কর্মী এই শিবিরে যোগদান করে। বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের বারোজন প্রতিনিধির যোগদানে শিবিরটি আন্তর্জাতিক মাত্রা লাভ করে। এছাড়াও বেহালা বোধয়ন স. পে. আ. -র ২৪ জন মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়া এবং বেহালা আলোক দিশারী স. পে. আ.-র ৩ জন দৃষ্টিহীন ভাইবোনের যোগদানও শিবিরটিতে বিশেষ মাত্রা এনে দেয়।

২৫শে ডিসেম্বর '০৩ বিকাল ৩ টায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই শিবিরের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী শৈলেন সরকার। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, বিভিন্ন রাজ্য এবং বাংলাদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান শিবির ব্যবস্থাপক কমিটির আহ্বায়ক মাননীয় বিধায়ক শ্রী সমর রায়। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জেলা সমাহর্তা শ্রী অশোক কুমার বালা, সভাধিপতি শ্রী গৌতম চক্রবর্তী, বিধায়িকা শ্রীমতী অসীমা চৌধুরী, জেলা পুলিস প্রধান শ্রী শশীকান্ত পূজারী, মালদা ডি. এস. এ. - র সম্পাদক এবং শিবির ব্যবস্থাপক কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রী অমরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী, অপর যুগ্ম সম্পাদক শ্রী নৃপেন্দ্র লাল সাহা, শিবির ব্যবস্থাপক কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি শ্রী উদয় সান্যাল, ইংলিশ বাজার পুরসভার পুরপ্রধান শ্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ। অঞ্চলের ভাইবোনেদের দৃষ্টিনন্দন অভিপ্রদর্শনীর পর বেলুনের সাহায্যে "সবপেয়েছির আসরের ৪৭ তম বার্ষিক সর্বভারতীয় শিবির" - প্ল্যাকার্ডটি আকাশে উড়িয়ে দেন মাননীয় মন্ত্রী ও শিবির ব্যবস্থাপক কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রী শৈলেন সরকার, সহযোগিতায় ছিলেন মূলকেন্দ্রের শিবির সচিব শ্রী জয়ন্ত দেশমুখ্য।

২৬শে ডিসেম্বর '০৩ শিবির পরিদর্শন করেন সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি ও শিবির উপদেষ্টা মাননীয় সাংসদ শ্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী। এই দিন দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। শিবির শিক্ষার্থী ও মালদার স্থানীয় ভাইবোনেরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ২৭শে ডিসেম্বর '০৩ সকাল ৮ টায় ডি. এস. এ. স্টেডিয়ামে শুরু হয় আন্তঃ অঞ্চল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বেহালা বোধয়ন আসরের মানসিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ভাই বোনেদের জন্য পৃথকভাবে বিষয় নির্বাচন করে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এই দিন বিকালে শিবির শিক্ষার্থীদের বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মালদা শহর পরিক্রমা করে।

২৮শে ডিসেম্বর '০৩ সকলা ১০ টা ৩০ মিনিটে বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন ড. রমেশ চন্দ্র বসু ও ড. ফাল্গুনী গুপ্ত মজুমদার প্রমুখ। সেমিনারে মানবজীবন তথা প্রাণীজগতে জলের প্রয়োজনীয়তা, জলের সংরক্ষণ ও ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা হয়। ঐদিন দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে সত্যসেবী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দীক্ষান্ত ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মিশন মালদা শাখার সম্পাদক স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজ। তিনি সত্যসেবী পদাধিকার পরীক্ষা ২০০৩ -এর উত্তীর্ণ কৃতী সোনারকাঠিদের পুরস্কার, প্রশস্তিকা ও স্মারক প্রদান করেন।

২৯শে ডিসেম্বর '০৩ শিবির শিক্ষার্থী ভাইবোনেরা 'ক্যুইজ' -এ অংশ নেয়। সঠিক উত্তরদাতাদের তখনই পুরস্কৃত করা হয়। ক্যুইজ মাস্টার ছিলেন ক্রীড়া সচিব বলরাম হালদার। আর একটি মজার বিষয় 'রিডিং ক্রিকেট' ভাইবোনেদের মধ্যে উপস্থাপন করেন রিডিং ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক ও মূলকেন্দ্রের কর্মী শ্রী তেজেশ অধিকারী। ঐদিন দুপুরে আয়োজিত স্মারক বক্তৃতায় বর্তমান অর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে এই ধরনের শিবির সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আলোচনা করেন সহঃ সভাপতি অপূর্ব গাঙ্গুলী, পরিচালনায় ছিলেন সংগঠন সচিব শ্রীদাম সাহা। ৩০শে ডিসেম্বর '০৩ শিবির পরিদর্শন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মহঃ সেলিম। শিবির ব্যবস্থাপক

কমিটির পক্ষ্য থেকে তাঁকে স্বাগত জানান মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শৈলেন সরকার এবং সবপেয়েছির আসরের সভাপতি অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়। বেহালা বোধয়ন আসরের ভাই বোনেরা সুন্দর নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বাঁকুড়া (১) অঞ্চলের সংগঠক শ্রী প্রণব বসু। এই দিন সন্ধ্যায় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় মালদা টাউন ক্লাবের সহযোগিতায়। শিবিরে অনুষ্ঠিত অনুর্ধ ১৪ বছর বালক ও বালিকা বিভাগের আন্তঃ অঞ্চল কাবাডি প্রতিযোগিতায় বালক বিভাগে উত্তর ২৪ পরগণা বিজয়ী ও হুগলী জেলা বিজিত এবং বালিকা বিভাগে হুগলী জেলা বিজয়ী এবং উত্তর ২৪ পরগণা বিজিতের সম্মান লাভ করে পুরস্কৃত হয়।

৩১শে ডিসেম্বর '০৩ বিকাল ৩ টায় শুরু হয় শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। সভাপতিত্ব করেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শৈলেন সরকার, প্রধান অতিথির আসনে মালদা ডি. আর. এম. শ্রী চরণজিৎ সিং, বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি শ্রী জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক শ্রী সমর রায়, জেলা সমাহর্তা শ্রী অশোক কুমার বালা, সবপেয়েছির আসরের সভাপতি অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শিবির ব্যবস্থাপক কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রী নৃপেন্দ্র লাল সাহা ও শ্রী অমরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী, ইংলিশ বাজার পুরসভার পুরপ্রধান শ্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় অতিথিবৃন্দ সহস্রাধিক শিবির শিক্ষার্থী ভাইবোনেদের আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করেন। স্বাগত ভাষণে স. পে. আ. - র সভাপতি অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় শিবির জীবনের গুরুত্ব উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠান সভাপতি মাননীয় শৈলেন সরকার সবপেয়েছির আসরের শিবির শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খল শিবির জীবনযাপনের প্রশংসা করে সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। শিবির ব্যবস্থাপক কমিটির মুখ্য সংযোজক শ্রী বরুণ দাশগুপ্তের হাতে শিবিরের সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য স্মারক তুলে দেন শিবির সচিব শ্রী জয়ন্ত দেশমুখ্য। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদেরও স্মারক প্রদান করা হয়। শিবিরে সর্বশ্রেষ্ঠ শিবির শিক্ষার্থীর সম্মান লাভ করে দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ পূর্বাচল আসরের বোন সুনন্দা দে। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শৈলেন সরকার অতিথি সহ সকল শিবির শিক্ষার্থীদের মালদার স্মারক আমের আচার প্রদান করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি স্থানীয় সঞ্চালন ব্যবস্থার মাধ্যমে কেবল্ নেটওয়ার্কে দেখানো হয়। এই শিবিরের পতাকা অবনমনের পর পরবর্তী শিবির সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে বাঁকুড়া (১) অঞ্চলের সংগঠকদের পক্ষ্য থেকে আসর পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন বাঁকুড়া - সোনামুখীর বিধায়িকা শ্রীমতী সুস্মিতা বিশ্বাস। এই শিবিরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সংবাদ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত হয় মালদা জেলার সহঃ সংগঠক শ্রী মানস রায়ের উদ্যোগে। ১লা জানুয়ারী '০৪ সকালে বাসযোগে শিবির শিক্ষার্থীরা গৌড় - এর ঐতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শন করে এবং ঐদিন বিকালে সকল শিক্ষার্থী, কর্মী নিজ অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করে।

২৮ তম পতাকা দিবস

সবপেয়েছির আসরের ২৮তম পতাকা দিবস পালিত হল ১২ই জানুয়ারী, ২০০৪। ৯ই জানুয়ারী, ২০০৪ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম পতাকাটি গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ও সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রী বীরেন জে. শাহ। রাজভবনে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সবপেয়েছির আসরের কার্যনির্বাহী সভাপতি ড. রমেশ চন্দ্র বসু, সহঃ সভাপতি অপূর্ব গাঙ্গুলী, মূল সত্যসেবী বিশ্বজিৎ খাস্তগীর, সহঃ মূল সত্যসেবী মৃণাল ব্যানার্জী, সংগঠন সচিব শ্রীদাম সাহা, প্রশিক্ষক ও আলোকচিত্রী সন্তু বসু প্রমুখ। টালীগঞ্জ পূর্বাচল ও নবারুন শিশু মিলন আসরের সোনাকাঠি ভাই বোনেরা পুষ্পস্তবক ও পতাকা মাননীয় রাজ্যপালকে প্রদান করে। এবছর শ্রেষ্ঠ অর্থসংগ্রহকারী আসরগুলি হল প্রথম - টালিগঞ্জ পূর্বাচল স. পে. আ. (দক্ষিণ কলকাতা), দ্বিতীয় - দক্ষিণ ২৪ পরগণা অঞ্চলের সারাঙ্গাবদ স. পে. আ. এবং তৃতীয় - নবারুণ শিশুমিলন স. পে. আ. (বেলঘরিয়া)।

অলিম্পিক ডে-রান

২৬শে জুন '০৪ শনিবার বেঙ্গল ওলিম্পিক এসোসিয়েশন্ আয়োজিত অলিম্পিক ডে-রান অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় তিন হাজার বিভিন্ন ক্ষেত্রের ক্রীড়াবিদ্ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম পর্যন্ত দৌড়ে অংশ গ্রহণ করে। সবপেয়েছির আসর-এর শতাধিক সোনারকাঠি ভাই বোন, কর্মী এবং কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যরাও অংশগ্রহণ করে। ঐ দিনের সমস্ত

ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনে আসরের কর্মীরা উদ্যোক্তাদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে।

৫৭তম কেন্দ্রীয় নববর্ষ উৎসব

সবপেয়েছির আসরের ৫৭ তম কেন্দ্রীয় নববর্ষ উৎসব ১৪১১ বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটিতে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে। বর্ষবরণের এই উৎসবে কলকাতা, উত্তর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী জেলার সব পেয়েছির আসরের শাখা সংগঠনগুলির প্রায় তিন হাজার শিশু কিশোর ভাই-বোন অংশ নেয়। আড়ম্বরের অভাব না থাকলেও পরিবেশ বিভাগের বিজ্ঞপ্তির কারণে মাইক্ ব্যবহারের প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সম্মতি না পাওয়ায় উৎসবের পরিচালক মন্ডলীকে সাময়িক অসুবিধার মধ্যে ফেললেও আনন্দের কথা কেন্দ্রীয় কর্মীদের তৎপরতা এবং শাখা আসরের কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই বাধা সহজেই অতিক্রম করে অনুষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত সকল কর্মসূচীগুলি যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে। বিকাল ৪টায় নবাকাঙ্খী আসরের কর্মীদলের সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা। আসর পতাকা উত্তোলন ও 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' - এই মূলভাবনায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার অভিবাদন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ডঃ জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়। আতিথি মঞ্চে উপস্থিত থেকে আশীবনী প্রদানের মাধ্যমে বড় হয়ে নিজেদের সু-নাগরিক গড়ে তুলে দেশ ও সমাজ কল্যাণে শিশু ও যুব সমাজকে আহ্বান জানান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডঃ জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ, বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত সম্পাদক শ্রী কমলেশ চ্যাটার্জী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সবপেয়েছির আসরের সভাপতি অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

আসরের সোনারকাঠি ভাইবোনেরা সমবেত অভিপ্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে সমবেত ব্যায়াম, ভঙ্গিগীতি, ছড়া প্রদর্শন, অঞ্চলগুলির পক্ষ্য থেকে প্রদর্শিত প্রাদেশিক লোকনৃত্য, যোগাসন ও পিরামিড উপস্থিত দর্শকমন্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। মাইকবিহীন এই উৎসবে অতিথিবৃন্দ মঞ্চ থেকে ময়দানে শিশুদের মাঝে এসে নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। প্রতিযোগিতা মূলক শোভাযাত্রায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী উত্তর কোলকাতা, উঃ ২৪ পরগণা (বারাসাত) ও হুগলী অঞ্চল প্রতিনিধিদের হাতে স্মারক তুলে দেন মাননীয় অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে নবাকাঙ্খী আসরের সংগীত সকল অনুষ্ঠানের সফল রূপায়ণে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যনিবাহী সমিতির কোষাধ্যক্ষ শ্যামল বসু।

৬০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ২৯ জুলাই '০৪ সবপেয়েছির আসরের ৬০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় শিশু ভবনে। স্বপন বুড়োর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন মূলকেন্দ্রের সংগঠন সচিব ও হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীদাম সাহা। শিশুভবন আসরের সোনারকাঠি ও কর্মী ভাই বোনেরা বাল্মিকী প্রতিভা নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে প্রশংসা পায়। পরিচালনায় ছিলেন আসরের সংঘমিত্রা কুমকুম কর্মকার। অঞ্চল সংগঠক রাধাগোবিন্দ পোদ্দার ও বড়িষা রোটারী ক্লাবের সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। অঞ্চল সহ সংগঠক জয়দেব বারুই ও নিখিল রায়ের নেতৃত্বে সত্যরঞ্জন মণ্ডল ও হরেন্দ্রনাথ দাসের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সাফল্য লাভ করে।

ভারতসেরা নবমিতালি

শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক চর্চা, সমাজসেবা, স্বনিযুক্তি প্রকল্প প্রবর্তন ও পথশিশু বিদ্যালয় ইত্যাদি ধারাবাহিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করে ভারত সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগের অন্তর্ভূক্ত নেহেরু যুবকেন্দ্র ২০০৩-০৪ সালের জন্য জাতীয় শ্রেষ্ঠ সংগঠন হিসেবে নবমিতালি সবপেয়েছির আসরকে মনোনীত করেছেন। জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত নবম রাষ্ট্রীয় যুব উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঝাড়খন্ডের মাননীয় রাজ্যপাল স্মারকলিপি ও পুরস্কার স্বরূপ একলক্ষ টাকা প্রদান করেছেন। নবমিতালি সবপেয়েছির আসরের এই স্বীকৃতি সবপেয়েছির আসরকেও গৌরবান্বিত করেছে।

সবপেয়েছির আসরের কেন্দ্রীয় কার্যনিবাহী সমিতি এই সাফল্যের জন্য নবমিতালি সবপেয়েছির আসর পরিচালন সমিতিকে অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং আসরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছে।

হীরক জয়ন্তী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১লা আগষ্ট'০৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী মঞ্চে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল সবপেয়েছির আসরের হীরক জয়ন্তী বর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। নবাকাঙ্খী আসরের উদ্বোধন সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে হীরক জয়ন্তী বর্ষব্যাপী কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন উদ্বোদক অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা, সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। মঙ্গলাচরণ করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক বুদ্ধদেব চক্রবর্তী। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সবপেয়েছির আসর ও হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডঃ অবদুস সাত্তার উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত নৃত্য পরিবেশনায় ছিলেন দক্ষিণ কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা অঞ্চল। এই অনুষ্ঠানটির নৃত্য পরিকল্পনায় শ্রীদাম সাহা এবং নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন পাঞ্চালী সাহা। বৃন্দগান পরিবেশনায় ছিলেন বারাসাত অঞ্চলের নবাকাঙ্খী আসর, যার পরিচালনায় ছিলেন সাগরিকা পই এবং দীপ্তা মজুমদার। উত্তর কলকাতা, হুগলী, উত্তর নদীয়া ও দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলের সোনারকাঠি ভাই-বোনেরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় নৃত্যছন্দে অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন - সুমনা চক্রবর্তী, দেবাশীষ সরকার, সতীনাথ ঘোষ ও সুজিত দে। সঙ্গীতে ছিলেন গণেশ মুখার্জী, দীপ্তা মজুমদার, সঞ্চিতা দাস, বলরাম মুখার্জী, তবলায় কাজল দাস, পারকারসানে শ্রীদাম সাহা, ভায্যে ছিলেন গোপাল ভৌমিক ও দীপ্তা মজুমদার। এই অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষণ সচিব অপরেশ মজুমদার। কেন্দ্রীয় সরকারের নাটক ও সঙ্গীত বিভাগের পক্ষে দিলীপ শর্মা যাদু প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে ছোটদের মহল আসরের ছোট ভাইবোনেরা "রঙিন পাখি দুষ্টু হুলো" নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে। এই নৃত্যনাট্যটির নৃত্য পরিকল্পনায় ছিলেন নন্দা চক্রবর্তী এবং পরিচালনায় ছিলেন প্রদীপ রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রায় একহাজার দর্শকের প্রশংসা লাভ করে।

হীরকজয়ন্তী বর্ষে
কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন

গত ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর '০৪ ব্যারাকপুর ছোটদের মহল সবপেয়েছির আসর ও সৃজনীর সুন্দর ব্যবস্থাপনায় উত্তর ২৪ পরগণার ব্যারাকপুরে শিশুঅঙ্গন মেন্টসরি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল সবপেয়েছির আসরের হীরক জয়ন্তী বর্ষে কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন।

৪ সেপ্টেম্বর '০৪ বিকাল ৫টায় আসর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক স্বপন প্রামানিক মহাশয়। উদ্বোধকের বক্তব্যে অধ্যাপক প্রামানিক সবপেয়েছির আসরের আঞ্চলিক সংগঠক-প্রতিনিধিদের স্মরণ করিয়ে দেন সময়ের পরিবর্তনের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্কে পরিণত হচ্ছে, সমাজের গঠন মূলক কাজের ক্ষেত্রে বাড়ছে প্রতিবন্ধকতা। সংগঠনের সংকল্পবাক্যের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে। সবপেয়েছির আসরের প্রতিনিধিদের শিশুদের শৈশব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। প্রধান অতিথি মাননীয় সাংসদ শ্রী তড়িৎ বরণ তোপদার গর্বের সাথে ঘোষণা করেন শৈশবে তিনিও সবপেয়েছির আসরের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয় রেখে সম্মেলনের মাধ্যমে কর্মসূচীর সময়োপযোগী পরিবর্তন ঘটিয়ে এগিয়ে চলার পরামর্শ দেন। সবপেয়েছির আসরের সভাপতি অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় চাকচিক্য জৌলুসতা দিয়ে বিচার না করে সমাজের বাস্তব প্রয়োজনীয়তার দিকটিতে দৃষ্টি রেখে সম্মেলনে শিশু-কিশোর গঠনমূলক কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য আলোচনা হওয়া প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেন। ধন্যবাদ জানান ছোটোদের মহল আসরের সংঘমিত্র শ্রী প্রদীপ রায়। উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর পুরসভার পৌর প্রধান শ্রী মহাদেব ঘোষ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী খোকন গাঙ্গুলী প্রমুখ। ব্যান্ডের মাধ্যমে সহযোগিতা করে স্থানীয় সবুজ সংঘ আসরের ভাইবোনেরা। দ্বিতীয় অধিবেশনে মূলকেন্দ্রের সচিববৃন্দ আগামী দু-বছরের জন্য নিজ নিজ বিভাগীয় কর্মসূচী পেশ করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের সংগঠক প্রতিনিধিবৃন্দ অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতি এবং হীরক জয়ন্তী বর্ষে বিভিন্ন কর্মসূচীর উল্লেখ করেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনটিতে উপস্থিত ছিলেন সবপেয়েছির আসরের হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন সমিতির চেয়ারম্যান, বেঙ্গল ওলিম্পিক এসোসিয়েশনের সম্পাদক ও বাংলার ব্রতচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, শিশু

অঙ্গন মন্টেসরি বিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রী সরোজ মৌলিক, রাজ্য খো-খো এসোসিয়েসনের সম্পাদক শ্রী দিলীপ রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সম্মেলনের সভাপতি মন্ডলীতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কার্যনির্বাহী সভাপতি ডঃ রমেশ চন্দ্র বসু, সহঃ সভাপতি শ্রী অপূর্ব গাঙ্গুলী, মুখ্য প্রশিক্ষক শ্রী সনৎ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষে হীরকজয়ন্তী কর্মসূচী বিশদভাবে আলোচনা করেন উদ্‌যাপন কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীদাম সাহা। জবাবী ভাষণ দেন মূল সত্যসেবী শ্রী মৃণাল ব্যানার্জী।

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গত ৪ ও ৫ই ডিসেম্বর'০৪ সবপেয়েছির আসরের হীরকজয়ন্তী বর্ষে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল মূলকেন্দ্রের পরিচালনা এবং হুগলী জেলা সবপেয়েছির আসরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায়। অঙ্কন, আবৃত্তি, সংগীত, ক্যুইজ, লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের স্মারক ও প্রশস্তিকা প্রদান করা হয়।

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির

গত ১১ ও ১২ ডিসেম্বর '০৪ সবপেয়েছির আসরের পরিচালনায় কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলের দিশারী আসরের ব্যবস্থাপনায় এবং ইয়ং এ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের সহযোগিতায় প্রশান্ত মেমোরিয়াল সুইমিং পুলে। পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন পৌরপিতা মাননীয় অজয় অধিকারী মহাশয়। সবপেয়েছির আসরের কার্যকরী সভাপতি ডঃ রমেশ চন্দ্র বসু স্বাগত জানান। বক্তব্য রাখেন ব্যবস্থাপক ক্লাবের সম্পাদক শ্রী বিষ্ণু জীবন চক্রবর্ত্তী, মূলসত্যসেবী মৃণাল ব্যানার্জী, হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সনৎ ভট্টাচার্য ও শ্রীদাম সাহা এবং ব্যবস্থাপক আসর সভাপতি মাননীয় তপন বসু মহাশয়। শিক্ষণ সচিব অপরেশ মজুমদারের নেতৃত্বে ৭২ জন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। সহঃ সভাপতি অপূর্ব গাঙ্গুলী, সহঃ মূল সত্যসেবী তরুণ চক্রবর্তী, শিবির সচিব দিলীপ চক্রবর্তী, প্রাক্তন মূল সত্যসেবী বিশ্বজিৎ খাস্তগীর এবং সংগঠনসচিব সাংগঠনিক আলোচনা করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সকল প্রশিক্ষকদের হাতে ব্যবস্থাপক আসর সভাপতি তপন বসু, ক্লাব সদস্য বিষ্ণুজীবন চক্রবর্তী স্মারক উপহার তুলে দেন। অঞ্চল সহঃ সংগঠক চন্দন শূর রায়ের আন্তরিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সফল হয়ে ওঠে।

হীরকজয়ন্তী বর্ষে বাঁকুড়ায় ৪৮ তম বার্ষিক শিবির

২৫শে ডিসেম্বর ২০০৪ দুপুর ২ টোর সময় বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উদ্বোধন হলো সর্বভারতীয় শিশু কিশোর প্রতিষ্ঠান সবপেয়েছির আসরের বার্ষিক শারীর শিক্ষা শিবির। উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে দীপাবলি সবপেয়েছির আসর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপক কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট সমাসসেবী অমিয় পাত্র। প্রধান উপদেষ্টা তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী উপেন কিস্কু, দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সুনীল খাঁ, বাঁকুড়া জেলার জেলাশাসক প্রভাত কুমার মিশ্র, জেলা সভাধিপতি পূর্ণিমা বাগ্‌দী, জেলা আবক্ষাধ্যক্ষ অনিল কুমার, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যদ্বয় সুষ্মিতা বিশ্বাস ও সুখেন্দু খাঁ, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ্ত কুমার মাইতি, বি.ডি.ও. অরুন্ধতী ভৌমিক, বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষাপর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি জ্ঞানশংকর মিত্র, সবপেয়েছির আসর মূলকেন্দ্রের মূলসত্যসেবী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি অপূর্ব গাঙ্গুলী প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন দীপবলী সবপেয়েছির আসরের সংঘমিত্র জয়দেব সাহা। ব্যবস্থাপক আসরের ভাইবোনেরা রাখী, চন্দন, স্মারক ব্যাজ, সংগীতের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেয়। মূলসত্যসেবী তাঁর ভাষণের মধ্যে দিয়ে আজকের সমাজে সবপেয়েছির আসরের প্রয়োজনীয়তার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেন। অর্থমন্ত্রী বলেন আজকের শিশুরা আগমীর ভবিষ্যৎ। তিনি শিশুদের সমাজের সমস্ত কুসংস্কার, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করতে বলেন, আগামী দিনে সবপেয়েছির আসরকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। শিক্ষাব্যবস্থাকে শারীর শিক্ষার সাথে যোগ করার ব্যাপারে সরকারী সাহায্যের কথা উল্লেখ করেন।

জেলা পুলিশ ব্যান্ড অতিথিদের 'গার্ড অব্ অনার' দেন। বড়জোড়া উচ্চ বিদ্যালয়, দীপাবলি সবপেয়েছির আসরের ভাইবোনেরা মেপোল, ভঙ্গিগীতি, নৃত্য পরিবেশন করে। পশ্চিমবঙ্গ - আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের শিল্পীরা ঝুমুর, রণপা পরিবেশন করেন। হীরক জয়ন্তী বর্ষ দৌড়ের সূচনা করেন অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত মহাশয়। ব্যবস্থাপক কমিটির সভাপতি শ্রী অমিয় পাত্র সবপেয়েছির আসরের ভূয়ষী প্রশংসা করেন, শিবির সার্থক করার জন্য সকলের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। প্রায় নয় শতাধিক শিবির শিক্ষার্থীকে সাথে নিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় অনগ্রসর সম্প্রদায় মন্ত্রী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সবপেয়েছির আসরের হীরক জয়ন্তী বর্ষের জন্য দৌড়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করেন।

২৬শে ডিসেম্বর '০৪ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী মাননীয় পার্থ দে মহাশয়। এই দিন অনুষ্ঠিত হয় জয়ন্ত দেশমুখ্য স্মারক বক্তৃতা। বক্তব্য রাখেন হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সনৎ ভট্টাচার্য, বর্ষীয়ান কর্মী অতুল বিশ্বাস, তপন গুপ্ত, ব্যোমকেশ ঘোষ, প্রণব বসু, দীপন্দ্রে নারায়ণ রায়চৌধুরী, দিলীপ চক্রবর্তী, জয়দেব সাহা ও বিকাশ প্রামাণিক। সভার সভাপতি অপূর্ব গাঙ্গুলী কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে কবিদাকে বাঁচিয়ে রাখা ও তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়ণের মাধ্যমে কবিদাকে শ্রদ্ধা জানানোর আবেদন জানান। এই দিন শিবির শিক্ষার্থীদের সুসজ্জিত শোভাযাত্রা বড়জোড়া গ্রাম পরিভ্রমণ করে। ২৭শে ডিসেম্বর '০৪ উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মাননীয় সুনীল খাঁ। এই দিন শিবির শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ক ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ২৮শে ডিসেম্বর '০৪ শিবির শিক্ষার্থীরা মুকুটমণিপুরে শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশ নেয়। সকাল ৮টায় ষোলটি বাসে মুকুটমণিপুরের বাঁধ দেখতে রওনা হয়ে ভাইবোনেরা মালভূমির চড়াই-উৎরাই পার হয়ে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে কংসাবতী নদীর ধারে পৌঁছয়। বাঁধের উপর ঘুরেবেড়িয়ে পাহাড় দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে দুপুরে ভাইবোনেরা বনভোজন সেরে বিশ্রামের পর আবার শিবিরে ফিরে আসে। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে নিক্কন-এর অনুষ্ঠান ছিল প্রশংসনীয়। ২৯শে ডিসেম্বর '০৪ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন গ্রামসমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীমতী অরুন্ধতী ভৌমিক। এদিন অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার। বর্জ্য পদার্থের সদ্ব্যবহার, জলের সদ্ব্যবহার ও সংরক্ষণের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন বাঁকুড়া জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের সহঃ আধিকারিক ডাঃ বিভূতিভূষণ প্রধান। দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় সত্যসেবী সমাবর্তন উৎসব। দীক্ষান্ত ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা বলেন এক সাথে পথ চলা, এক সাথে কথা বলা, এক সাথে ভাবতে শেখায় এই ধরনের সংগঠন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মাদ্রাসা শিক্ষক পর্ষদের সভাপতি ড. আবদুস সাত্তার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী জ্ঞানশংকর মিত্র প্রমুখ। স্বাক্ষরতা স্মারক বক্তৃতায় শ্রী মিত্র সমাজের অনেক মানুষ যারা আজও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তাদেরও শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ছোটদের মধ্যে নিহিত শক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শিশুদের শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ দিতে হবে। সংগঠন সভাপতি অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় মানুষের প্রতি ভালবাসা রেখে সমাজের কাজে এগিয়ে আসা এবং সুনামির ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে শিশুদের উৎসাহিত করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য মাননীয় সভাপতির আহ্বানে শিবিরে শিক্ষার্থী ভাই-বোন, কর্মী ও কেন্দ্রীয় কর্মীদের সংগৃহীত অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর সুনামি ত্রাণ তহবিলে জমা হয়েছে। ৩০শে ডিসেম্বর '০৪ ড. আবদুস সাত্তার, আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তণ চেয়ারম্যান শ্রী অশোক সামন্ত, অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রী সোমনাথ গড়াই প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মূলকেন্দ্রের জেলা ও কেন্দ্রীয় স্তরের কর্মীদের সঙ্গে একটি সাংগঠনিক সভায় অংশ নেন। দুপুরে প্রাক্তণ মূলসত্যসেবী শ্রী প্রদীপ রায় হীরক জয়ন্তী বর্ষের কর্মসূচীর বাস্তবায়নের বিষয়টি আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীদাম সাহা। বিকালে শিবির পরিদর্শন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী অরুণ চৌধুরী এবং বড়জোড়ার বিধায়িকা শ্রীমতী সুস্মিতা বিশ্বাস। ৩১শে ডিসেম্বর '০৪ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিবির ব্যবস্থাপক কমিটির সভাপতি শ্রী অমিয় পাত্র মহাশয়। প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী উপেন কিস্কু, উপস্থিত ছিলেন সাংসদ শ্রী সুনীল খাঁ, সংগঠন সভাপতি অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপুর এন. আই. টি.-র ডিরেক্টর ড. আশিষ চন্দ্র গাঙ্গুলী, বিধায়ক শ্রী সুখেন্দু খাঁ, বিধায়িকা শ্রীমতী সুস্মিতা বিশ্বাস, শিক্ষাবিদ শ্রী জ্ঞান শংকর মিত্র, শিবির ব্যবস্থাপক কমিটির সম্পাদক শ্রী প্রণব রঞ্জন বসু প্রমুখ। শিবির শিক্ষার্থী ভাইবোনেরা আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের মাধ্যমে মাননীয়

অতিথিদের অভিবাদন জানায়। বিভিন্ন ফ্যান্সি ড্রিল, ভঙ্গিগীতি, সমবেত ব্যায়ামাদি, ব্রতচারী, প্রাদেশিক লোকনৃত্য পরিবেশন করে দর্শকমন্ডলীর প্রশংসালাভ করে। শিবিরে অংশগ্রহণকারী সিকিম ও হরিয়ানা থেকে অংশগ্রহকারী ভাইবোনেরা ড্যান্স অব্ সিকিম ও ভাঙ্গরা নৃত্য প্রদর্শন করে। মূলকেন্দ্রের পক্ষ্য থেকে সিকিম ও হরিয়ানা দলকে অংশগ্রহণ এবং সুন্দর শিবির ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবস্থাপক কমিটিকে স্মারক প্রদান করা হয়। শিবির শিক্ষার্থীদের পক্ষ্য থেকে অনুষ্ঠান সভাপতি শ্রী অমিয় পাত্রের হাতে একটি সুন্দর স্মারক তুলে দেন সংগঠন সভাপতি অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপ্যধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের কার্যনিবাহী সভাপতি ডঃ রমেশ চন্দ্র বসু। পতাকা অবনমনের পর পরবর্তী কর্মী শিবির সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে পতাকা গ্রহণ করেন মূলকেন্দ্রের শিবির সচিব শ্রী দিলীপ চক্রবর্তী। শিবিরে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীর সম্মান পায় মেদিনীপুরের সৈনিক আসরের বোন মিঠু কবিরাজ ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী ভাই দক্ষিণ ২৪ পরগণার সারাঙ্গবাদ আসরের ঋষভ চ্যাটার্জী। সুন্দর আতসবাজি প্রদর্শন শিবির শিক্ষার্থী ও দর্শকমন্ডলীকে আনন্দদান করে।

২৯তম পতাকা দিবস

১১ই জানুয়ারী, ২০০৫ সবপেয়েছির আসরের হীরক জয়ন্তী বর্ষে রাজ্য জুড়ে ২৯ তম পতাকা দিবস ও সংহতি দিবস পালন করা হয়। ১০ই জানুয়ারী '০৫ রাজভবনে প্রথম পতাকাটি আনুষ্ঠাকিভাবে গ্রহণ করেন পশ্চিবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ও সবপেয়েছির আসরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রী গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী। রাজভবনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কার্যনিবাহী সভাপতি ড. রমেশ চন্দ্র বসু, সহঃ সভাপতি অপূর্ব গাঙ্গুলী, মূল সত্যসেবী মৃণাল ব্যানার্জী, সহঃ মূল সত্যসেবী তরুণ চক্রবর্তী, সংগঠন সচিব শ্রীদাম সাহা, শিবির সচিব দিলীপ চক্রবর্তী, প্রশিক্ষক আশীষ দাস ও জয়দেব বাড়ুই। মাননীয় রাজ্যপালকে পতাকা ও পুষ্পস্তবক প্রদান করে সারাঙ্গাবাদ ও সতীন সেন আসরের সোনারকাঠি ভাই বোনেরা। আলোকচিত্রী ছিলেন প্রশিক্ষক সন্তু বসু। অনুষ্ঠানটি কলকাতা দূরদর্শন, তারা বাংলার বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও আকাশবানী, প্রতিদিন ও বর্তমান পত্রিকায় প্রচারিত হয়। এবছর শ্রেষ্ঠ অর্থসংগ্রহকারী আসরের সম্মান লাভ করে ১ম - দক্ষিণ ২৪ পরগণা অঞ্চলের সারাঙ্গাবাদ স. পে. আ., ২য় - পুরুলিয়া অঞ্চলের তরুণ সংঘ স. পে. আ. এবং ৩ য় - দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলের গার্ডেনরীচ স. পে. আ.।

'মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও'

গত ২০শে জানুয়ারী '০৫ পশ্চিবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত ভূমিকম্প ও সুনামিতে বিপন্ন লক্ষ লক্ষ মানুষের পাশে দাঁড়াতে এক বিশাল পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পার্কসার্কাস ময়দান থেকে নেতাজী ইন্ডোর। প্রায় ২০ হাজার মানুষ এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। সবপেয়েছির আসরের সহঃ সভাপতি অপূর্ব গাঙ্গুলী ও মূল সত্যসেবী মৃণাল ব্যানার্জীর নেতৃত্বে শ্রীদাম সাহা, বিশ্বজিৎ খাস্তগীর, শ্যামল বসু, তরুণ চক্রবর্ত্তী, অপরেশ মজুমদার, পতিত পাবন দাস, ব্যোমকেশ ঘোষ, প্রণব রায়, রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, অপরেশ সরকার সহ ৭৫ জন স্বেচ্ছাসেবক পদযাত্রা ও জলযোগের মুখ্যদায়িত্ব সুনামের সাথে পালন করে। উপস্থিত ছিলেন সহঃ সভাপতি অজিত বসু। সবপেয়েছির আসরের ৩০০ জন সোনারকাঠি ও কর্মী ভাইবোন পদযাত্রায় অংশ নেয়।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

উত্তর ২৪ পরগণা (১) অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় হীরক জয়ন্তী বর্ষে সবপেয়েছির আসরের কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল ২৯ ও ৩০ জানুয়ারী '০৫। আঞ্চলিক / জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে কৃতী সোনারকাঠি ও কর্মী ভাই-বোনেরা এই কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নিজ আসর তথা জেলা বা অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে। ২৯শে জানুয়ারী '০৫ সন্ধ্যায় নবব্যারাকপুরের কোদালিয়া আগাপুর বিদ্যালয়ে প্রতিযোগীরা উপস্থিতি জানায় এবং ৩০ জানুয়ারী '০৫ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নবব্যারাকপুর কলোনী বয়েজ স্কুলের ময়দানে। ঐদিন সকাল ৯টায় উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন নবাকাঙ্খী আসরের কর্মী বোনেরা। প্রধান অতিথি তথা উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উদয়াদিত্য ভট্টাচার্য্য অধ্যক্ষ, গোপাল চন্দ্র মেমোরিয়াল কলেজ অব্ এডুকেশন, বিশেষ

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী পরেশ মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট সমাজসেবী ও গ্রাম-নগর পত্রিকার সম্পাদক।

সবপেয়েছির আসরের কার্যনির্বাহী সভাপতি ডঃ রমেশ চন্দ্র বসু, সহঃ সভাপতি শ্রী অপূর্ব গাঙ্গুলী, শ্রী অজিত বসু, মূল সত্যসেবী মৃণাল ব্যানার্জী, বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ও নবব্যারাকপুর উপনিবেশ গঠনের অত্যতম স্রষ্টা শ্রী কানাইলাল দত্ত, নীলমাধব দত্ত, অধ্যাপক অরুণ মুন্সী, শিক্ষক ও কবি কাশীনাথ বন্দোপাধ্যায়, চলন্তিকা আসরের সভাপতি শ্রী অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নবাকাঙ্খী আসরের সভাপতি শ্রী মনোজ দাস, নবাকাঙ্খী আসরের সংঘমিত্র দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং মূলকেন্দ্রের প্রশিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মূলকেন্দ্রের ক্রীড়াসচিব বলরাম হালদারের নেতৃত্বে যাদবপুর এম. পি. এড. ট্রেনিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় প্রায় ১২৫ জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সাফল্য লাভ করে।

এই প্রতিযোগিতার পুরস্কারগুলির আর্থিক দায়ভার গ্রহণ করেন মেসার্স ইউনাইটেড স্পোর্টস এন্ড কোং। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অঞ্চলের সম্মান লাভ করে হুগলী জেলা সবপেয়েছির আসর।

৫৮ তম কেন্দ্রীয় নববর্ষ উৎসব

সবপেয়েছির আসরের হীরক জয়ন্তী বর্ষে ৫৮তম কেন্দ্রীয় নববর্ষ উৎসবের আয়োজন হয়েছিল উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে ১লা বৈশাখ ১৪১২ বিকাল ৪টায়। নবমিতালি আসরের পরিবেশনায় উদ্বোধন সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা। রাখী ও চন্দনে মাননীয় অতিথিদের বরণ করে নিল নবদিগন্ত আসরের বোনেরা, আসর পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা। এছাড়াও বর্ষবরণ উৎসবে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডঃ সুলোপানী ভট্টাচার্য, সবপেয়েছির আসরের সভাপতি অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সাংসদ মহম্মদ সেলিম, বেঙ্গল ওলিম্পিক এসোসিয়েশনের সম্পাদক ও সবপেয়েছির আসরের হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির চেয়ারম্যান কমলেশ চ্যাটার্জী, সবপেয়েছির আসরের সহঃ সভাপতিমন্ডলীর সদস্য অজিত বসু,গনেশ ঘোষ, অপূর্ব গাঙ্গুলী প্রমুখ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শতবর্ষে এবছরের নববর্ষ উৎসবের মূল ভাবনা ছিল-"১৯০৫ দেখায় আলো। শিখবো দেশকে বাসতে ভালো"। এই ভাবনায় বিভিন্ন অঞ্চলের আসরগুলির বর্নাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মাননীয় অতিথিবর্গকে আনুষ্ঠানিক অভিবাদন জানায় সবপেয়েছির আসরের সোনারকাঠি ও কর্মীদল। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মূল সত্যসেবী মৃনাল ব্যানার্জী। কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিন ২৪পরগনা, হাওড়া,হুগলী ও নদীয়া জেলার সবপেয়েছির আসরের কচি-কাঁচা (সোনারকাঠি). রা সমেবেত ভঙ্গিগীতি, ব্রতচারী, ছন্দময় ব্যায়াম পরিবেশন করে। বর্ষবরণ নৃত্য পরিবেশন করে উত্তর কলকাতা অঞ্চলের আসরের বোনেরা, আঞ্চলিক লোকনৃত্যের পরিবেশনায় ছিল দক্ষিণ কলকাতা, বারাসত, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া অঞ্চলের আসরগুলি। অনুষ্ঠানের অতিথিবর্গ সবপেয়েছির আসরের সোনারকাঠি ভাইবোনেদের নববর্ষের পূন্যলগ্নে আশীর্বানী প্রদান করে সুনাগরিক রূপে আগামী দিনে সমাজ উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহবান জানান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের সহঃ সভাপতি গণেশ ঘোষ, অনুষ্ঠানে অভিপ্রদর্শনী পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মূলকেন্দ্রের শিক্ষন সচিব অপরেশ মজুমদার ও সংগঠনসচিব শ্রীদাম সাহা, সঞ্চালনায় ছিলেন কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ শ্যামল বসু, অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্বে ছিলেন উত্তর কলকাতা অঞ্চলের সহঃ সংগঠক সব্যসাচী চৌধুরী, দপ্তর ও মূল প্রবেশদ্বার এর দায়িত্বে ছিলেন শিবির সচিব দিলীপ চক্রবর্তী ও দঃ কলকাতার সহঃ সংগঠক জয়দেব বারুই, শোভযাত্রা পরিচালানায় সহঃ মূল সত্যসেবী তরুণ চক্রবর্তী ও প্রশিক্ষক সুদাম মাহিন্দার, স্বেচ্ছাসেবক ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সেবা সচিব পতিত পাবন দাস ও উত্তর নদীয়া অঞ্চলের সহঃ সংগঠক প্রভাস রায়, প্রতিযোগিতামূলক শোভাযাত্রায় বিচারকদের দায়িত্বে ছিলেন প্রাক্তণ মূল সত্যসেবী প্রদীপ রায়, প্রচারের দায়িত্বে বিভাগীয় সচিব অপরেশ সরকার, জলযোগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন মূলকেন্দ্রের পরীক্ষা সচিব ব্যোমকেশ ঘোষ ও দক্ষিন কলকাতা অঞ্চলের সংগঠক ভবানী মূখার্জী এবং সমগ্র অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির দায়িত্বে ছিলেন মূলকেন্দ্রের মূখ্য প্রশিক্ষক সনৎ ভট্টাচার্য। পতাকা অবনমন করেন মাননীয় সাংসদ জনাব মহম্মদ সেলিম। প্রতিযোগিতামূলক বর্নাঢ্য শোভাযাত্রায় বারাসাত অঞ্চল প্রথম, দ্বিতীয় হুগলী অঞ্চল এবং দক্ষিণ কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা অঞ্চল তৃতীয় স্থান লাভ করে পুরস্কৃত হয়। অনুষ্ঠানে শিশুদের

জলযোগের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন মেসার্স করনেশান এন্ড কোম্পানী। নববর্ষের এই অনুষ্ঠানে প্রতি বছরের মতো বহু প্রাক্তণ কেন্দ্রীয় কর্মী উপস্থিত থেকে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সংগঠনের বর্তমান পরিচালকমন্ডলীকে উৎসাহিত করেন। মিষ্টিমুখের মাধ্যমে সুন্দর এই শিশু উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

হীরক জয়ন্তী বর্ষে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক কর্মশালা

গত ১৪ ও ১৫ মে '০৫ সবপেয়েছির আসর মূলকেন্দ্রের পরিচালনায় এবং মুরারীপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় হীরকজয়ন্তী সাংস্কৃতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল উত্তর কলকাতার মুরারীপুকুর শেঠবাগানে, শিশু শিক্ষা শিবির প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৪ই মে '০৫ বিকাল ৫টায় আসর পাতাকা উত্তোলনের মাধমে কর্মশালার অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সবপেয়েছির আসরের সভাপতি অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বিমলেন্দু বিশ্বাস। সভাপতি মহাশয় সমবেত শিবির শিক্ষার্থীদের সুস্থ মন ও সুস্থ পরিশীলিত রুচি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কর্মশালায় আবৃত্তির বিষয় নির্বাচন ও ভাল আবৃত্তি করার কলাকৌশল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন বাগবাজার কলামন্দির শিক্ষায়তনের শ্রীমতী ইন্দিরা রায়। সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করেন প্রাক্তণ মূল সত্যসেবী প্রদীপ রায় এবং ক্যুইজ বিষয়ে আলোচনা করেন অপর প্রাক্তণ মূল সত্যসেবী সোমেশ ভূঁইঞা, মুকভিনয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন মুকুল দেব ও তাপস সরকার। শিশু নাটক রচনা, পরিচালনা ও প্রযোজনা বিষয়ে আলোকপাত করেন ড. অপূর্ব দে। সংগীত শ্রেনী পরিচালনায় ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক দীপ্তা মজুমদার ও গণেশ মুখার্জী। মঞ্চ, আলো, নাট্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কর্মী মিহির মুখার্জী। ওরিগ্যামী শিক্ষাদান করেন অশোক দাস। এই সাংস্কৃতিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, উঃ ২৪ পরগণা - ১ (বারাসাত) এবং উঃ ২৪ পরগণা (বারাকপুর) অঞ্চলের ভাইবোনেরা। ছড়া লেখা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ভাই-বোনেদের উৎসাহ ছিল উল্লেখযোগ্য।

রাজ্য যুব উৎসবে আমরা

১৭ই জুলাই ২০০৫ যুব উৎসব উপলক্ষে রাজ্য যুবকল্যাণ বিভাগ আয়োজিত বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হল কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দান থেকে কলকাতা ময়দানের গোষ্ঠপাল মূর্ত্তির পাদদেশ পর্যন্ত। রাজ্যস্তরের বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা, সমাজসেবী সংগঠন, কলকাতার শেরিফ প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ চুনী গোস্বামী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় এই শোভযাত্রায় অংশ নেয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ এবং পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী, বেঙ্গল ওলিম্পিক এসোসিয়েশনের সম্পাদক কমলেশ চ্যাটার্জী, সবপেয়েছির আসরের সহঃ সভাপতিমন্ডলীর সদস্য অপূর্ব গাঙ্গুঁলী এবং মূল সত্যসেবী মৃণাল ব্যানার্জীর নেতৃত্বে সবপেয়েছির আসরের প্রায় তিরিশ জন সেচ্ছাসেবক এই শোভযাত্রার পরিচালন সহযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সংগঠনের সুনাম বৃদ্ধি করে। ২৪শে জুলাই, ২০০৫ যুব উৎসব উপলক্ষে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় মূলকেন্দ্রের পরীক্ষা সচিব ব্যোমকেশ ঘোষের নেতৃত্বে ১৫ জন কর্মী ভাই স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে এবং এই যুব উৎসবের অঙ্গ কলকাতা থেকে বীরভূমের সিউড়ী পর্যন্ত মোটর সাইকেল শোভযাত্রার পরিচালন সহযোগিতায় মূলকেন্দ্রের সেবাসচিব পতিতপাবন দাসের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন মূলকেন্দ্রের কার্যনির্বাহি সমিতির সদস্য সজল চন্দ ও দঃ ২৪ পরগণা অঞ্চলের সহঃ সংগঠক জয়দেব বারুই। শোভাযাত্রা শুরু হয় ২৭ জুলাই '০৫ সকাল ৮ টায়।

৬১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

সবপেয়েছির আসরের ৬১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হল কেন্দ্রীয় শিশুভবন, বেহালায় ২৯শে জুলাই, ২০০৫ বিকাল ৫টায়। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিমাংশু শেখর রায়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সবপেয়েছির আসরের কার্যনিবার্হী সভাপতি ডঃ রমেশ চন্দ্র বসু। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মূল সত্যসেবী মৃনাল ব্যানার্জী। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশুভবন আসরের বোন সুমনা ভৌমিক, দিশারী আসরের বোন গৌরী দাস, বেহালা

বোধয়ন আসরের ভাই সুব্রত ঘোষ একক সংগীত পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করে। নৃত্য পরিবেশন করেন অনিমা পোদ্দার, ফেন্ডস্ ইলেভেন আসরের বোন, সতীন সেন স্মৃতি সংঘ আসরের বোন সুমনা প্রধান, দিশারী আসরের চৈতালী দাস, বাঘাযতীন আসরের বোন পূজা চক্রবর্তী ও তানিয়া সরকার। সমবেত নৃত্য পরিবেশনায় ছিল বোধয়ন আসর এবং বাঘাযতীন আসরের বোনেরা। আবৃত্তি পরিবেশন করে সুজাতা দেবনাথ ও সুতপা কর্মকার। অনুষ্ঠানে হীরকজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সনৎ ভট্টাচার্য, সংগঠনের সহঃ সভাপতি অজিত বসু ও গনেশ ঘোষ সোনারকাঠি ভাইবোনেদের আশার্বানী প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির অপর যুগ্ম সম্পাদক শ্রীদাম সাহা , পরীক্ষা সচিব ব্যোমকেশ ঘোষ, শিশুভবন ভারপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নিখিল রায়, দপ্তর সচিব রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, দক্ষিণ কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা অঞ্চলের সংগঠক ভবানী মুখার্জী, সহঃ সংগঠক জয়দেব বারুই, প্রশিক্ষক সুজিত দে প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন প্রশিক্ষক গোপাল ভৌমিক। কেন্দ্রীয় শিশুভবনের সংগীত শিক্ষিকা তানিয়া সরকার ও অঙ্কন শিক্ষিকা সুমনা ভৌমিক, বেহালা বোধয়ন, সতীন সেন স্মৃতি সংঘ, বাঘাযতীন, শিশুভবন ও সুকান্তমেলা আসরের ভাইবোনেরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ, 'নদী' গীতিআলেখ্য ছিল বিশেষ আকর্ষনীয়।

সত্যসেবী পদাধিকার পরীক্ষা ২০০৪

১ম	পল্লব দাস	সৈনিক স. পে. আ.	মেদিনীপুর
২য়	অনন্যা গাঙ্গুলী	পূবালী স. পে. আ.	বেলঘরিয়া
৩য়	মিঠু কবিরাজ	সৈনিক স. পে. আ.	মেদিনীপুর

সত্যসেবী পদাধিকার পরীক্ষা ২০০৫

১ম	আব্দুল করিম মন্ডল	অনন্দমেলা স.পে.আ.	বাঁকুড়া (২)
২য়	অর্কদেব চক্রবর্তী	শ্যামলিমা	দুর্গাপুর
৩য়	চুমকি বৈরাগ্য	শ্যামলিমা	দুর্গাপুর

নববর্ষ উৎসব ১৪১২।

নববর্ষ উৎসবে (১৪১২) আসরের ভাই-বোনেরা।

With Best Wishes From :

Computerized Digital Still & Vedio Photography, Still Photo Editing & Restoration And Camas Painting, Concrete & Metal Sculpturing

Studio Charukala

Artist & Photographer

Prop. Rohitaswa Ghosh

Uttarnarayanpur, Paruldanga, Bolpur, Shantiniketan, Birbhum (W.B.)

Congratulation Diamond Jubilian From :

SURFACE

- Invitation Card
- *Greetings Card*
- Latest art of Printing
- **PCO Booth**

O. T. Road, Puratan Bazar (Bus stop), Kharagpur - 721301, Paschim Medinipur.

With Best Compliments From :

Samsul Tarafdar

Govt. Contractor (P.W.D.)

Baruipur, Najrul Sarani

South 24 Parganas

With Best Wishes From :

M/S. New Mech Tech Pvt. Ltd.

Howapota, Sankrail

Phone : 2679-0470

With Best Wishes From :

M. Saha

(Agent BMS club members)
(Code No. 2540-468)

Life Insurance Corporation of India

Address : C/o. Joydeb Saha
Barjora, Bankura

হীরক জয়ন্তী বর্ষে শুভকামনায় —

দীপাবলী

সবপেয়েছির আসর

বড়জোড়া, বাঁকুড়া

With Best Wishes From :

M/s. A. K. Nayek

Contractor : Bokaro Thermal

G. M. Colony, P. O. Bokaro Thermal,
Dist. Bokaro, Pin - 829107

With Best Wishes From :

Paulomi Dey
Dipanjan Dey
&
Arati Dey

44/38/1, Naskarpara Lane,
B. Garden, Howrah - 711 103

Space donated by :

Tapan Chakraborty

With Best Wishes From :

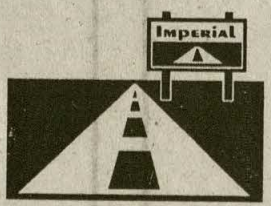

IMPERIAL PETROL SERVICE STATION

3, Vivekananda Road, Kolkata - 7

With Best Wishes From :

W. B. Projects
Consultant & Engineer

IN
PROJECT MANAGEMENT
SERVICE
WITH
LONG AND WIDE RANGE
EXPERIENCE

P-254, Parnasree Pally
Kolkata - 700 060

সবপেয়েছির আসরের হীরক জয়ন্তী
পূর্তি উৎসবের সাফল্য কামনায় —

শিশুশিল্পী
সবপেয়েছির আসর
(২৫৪, পর্ণশ্রী পল্লী, তরুছায়া)
পর্ণশ্রী ক্লাব ☆ কলকাতা - ৭০০ ০৬০

With Best Compliments From :

M/s. Veejay
International (India)

1, Ramjidas Jethia Lane
(2nd Floor)
Kolkata - 700 007

With Best Compliments From :

Salil Sen

Engineer & Govt. Contractor

21, B. L. Chowdhury Road,
Bobilapara, Burdwan

Best Wishes From :

Krishnagopal Travels
(Bersha)

Kolkata	To	Salpatta
08.05		9.25

বেড়াতে যাওয়া এবং যে কোন অনুষ্ঠানে
বাস ভাড়া দেওয়া হয়।
যোগাযোগ ঃ 9433125507 (M),
9433391335 (M)

With Best Compliments From :

Sujata Protin & Food
Products (P) Ltd.
154F, B. T. Road (Ponihatty)
24 Parganas (North), W.B.

Our Products : Sujata Biscuits, Sujata Sayabins, Sujata Coconut Oil, Sujata Samui

গ্রামীন উন্নয়নের ঐতিহ্যের —
'মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী আন্দোলন'-কে
এগিয়ে নিয়ে যাবার আবেদন জানাই —

বিবেকানন্দ মিশন

পালপাড়া ☆ চাকদহ ☆ নদিয়া

With Best Compliments From :

Phone : 2521-3627

FABTECH INDUSTRIES

(THERMAL INSULATION & ARCHITECTURE)

110/1, Dakhindari Road,
Kolkata - 700 048

Tele Fax : 033-2534 3207
E-mail : fabtechind@vsnl.net

Phone : 2445-8850
Fax : 91-33-2407 1436

MECHTECH DESIGNEERS & ENGINEERS PVT. LTD.

NATIONAL AWARD WINNER

Manufacturer of :

Automatic Biscuit & Bakery Machinery
Industrial Oven
Battery Processing Equipments etc.

19-D, Dr. A. K. Paul Road, Behala, Kolkata - 700 034
E-mail : Laha@satyam.net.in
Web : www.mechtechindia.com

Contact Person : *M. M. Laha*
Managing Director

With Best Wishes From :

Phone : 2461-2083

Polestar Study Care Centre

6/1, Fern Road
Kolkata - 700 019

With Best Compliments From :

Mob : 9830082446

M/s. Modern Construction

7/3, Jodhpur Colony
Lake Gardens
Kolkata - 700 045

With Best Wishes From :

Phone : 2234570 & 22345759

Mohurgong & Gulma Tea Estates

WASHABARIE TEA CO. PVT. LTD.

P-17, Ganesh Chandra Avenue,
Kolkata - 700 013

সবপোয়েছির আসরের হীরক জয়ন্তী পূর্তি উৎসবের সাফল্য কামনায় —

শ্রী প্রদীপ

হস্তরেখা ও জ্যোতিষবিদ্

সাম্প্রতিকালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী

দূরভাষ ঃ ০৩৩-২৬৫২-১৫৬৬ (বাড়ী)
০৩৩-৩১০২-১৯৪৪ (মোবাইল)

Library